হৃদয়বতী

সমরেশ মজুমদার

হৃদয়বতী

হৃদয়বতী

সমরেশ মজুমদার

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির ○ কলকাতা

HRIDAYBATI
By Samares Mazumder
Published by
Ujjal Sahitya Mandir
C-3. College Street Market
Kolkata-7 Ph: 241-4658

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা, ২০০২

পরিবেশনায় ঃ
উজ্জ্বল বুক স্টোরস্
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭

প্রকা শিকা ঃ
সুপ্রিয়া পাল উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির
সি-৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-৭

প্রচ্ছদ চিত্র ঃ
পরমা মজুমদার

বর্ণসজ্জায় ঃ
প্রিন্ট-এন্ পাবলিকেশন

মুদ্রণে ঃ
প্রিন্টিং সেন্টার
১, ছিদাম মুদি লেন
কলকাতা-৬

দুপুরে ঘুমায় না সুবর্ণা। ঘুমালেই ফিগারের সর্বনাশ হয়ে যাবে। লোকে বলে সে তথাকথিত সুন্দরী নয়, কিন্তু তার ফিগার দুর্দান্ত। বাঙালি মেয়ে হিসেবে পাঁচফুট যার নেহাৎ খারাপ নয় যে। শরীরে যেটুকু মেদ ঠিকঠাক জায়গায় না থাকলে নয় সেইটুকুই রয়েছে। তুহিন বলেছে, 'তোমার ফিগার যে কোন আমেরিকান অভিনেত্রীর চেয়েও সুন্দর।'

'কিন্তু আমি তো সুন্দরী নই!' মুখে মেঘ জমায় সুবর্ণা।

'সুন্দরী কাকে বলে? শুধু মুখ সুন্দর হলেই সুন্দরী? বাঙালি মেয়েদের একটা ধারণা ছিল। ঢলো ঢলো মুখ, ফর্সা গায়ের রঙ আর মোটুসটু শরীর হলেই ঘরের লক্ষ্মী হওয়া যাবে। এই ধারণাটা যে কতবড় ভুল তা আজকাল কেউ কেউ বুঝতে শিখেছে।' তুহিন বলেছে।

অতএব ফিগার ঠিক রাখতে অনেক অনেক পরিশ্রম করতে হচ্ছে সুবর্ণাকে। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি করেছে, নিয়ম করে আসন করছে। দুপুরে হয় টিভি, নয় পাশের ফ্ল্যাটের নব্বুই বছরের বৃদ্ধের সঙ্গে গিয়ে গল্প করে সে। কথা বলার মানুষ পেলে খুব খুশী হন বৃদ্ধ। এখনও স্মৃতিশক্তি প্রখর। আশি বছর আগের কাহিনী শুনতে বেশ ভাল লাগে সুবর্ণার।

এখন বিকেল পাঁচটা। একটু পরেই তুহিন ফিরবে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে সাজাচ্ছিল সুবর্ণা। এই সময় টেলিফোন বাজল। নিশ্চয়ই তুহিন। দেরিতে আসবে বলে একটা বাহানা করবে। দৌড়ে গিয়ে রিসিভার তুলল সে, 'হেলো!'

'হ্যালো।' একটু খসখসে গলা মহিলার।

'হ্যাঁ, বলুন।'

'কি করছ?' মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন।

'আপনি কে বলছেন?' চিনতে পারল না সুবর্ণা।

'সাজগোজ শেষ হল?' এবার একটু হাসি শোনা গেল।

'আপনি কে কথা বলছেন?' রেগে গেল সুবর্ণা।

'আমার পরিচয় জেনে তোমার কি লাভ হবে? নাম বললেও চিনতে পারবে না। যাক গে, একটু পরেই তোমার স্বামী বেল বাজাবে। তুমি ছুটে

গিয়ে দরজা খুলবে। সে ঘরে ঢুকলে আদুরে বেড়ালের মত তার গায়ে গা ঘষবে। কি? ঠিক বলেছি তো?'

'দেখুন, আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আপনার সঙ্গে কোন কথা বলতে আমি চাইনা। তাছাড়া আপনার পরিচয়ও আমি জানিনা। রাখছি।'

''দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমার স্বামী যখন বাড়ি ফিরবে তখন দেখো তো ওর গলার পাশে লিপস্টিকের দাগ আছে কিনা! হালকা সবুজ রঙের লিপস্টিক।'

লাইনটা কেটে গেল।

রিসিভার ধরে পাথর হয়ে গেল সুবর্ণা। একি শুনল সে? তুহিনের গলার পাশে কার লিপস্টিকের দাগ থাকবে? সুবর্ণা জানে ওইখানে চুমু খাওয়া খুব পছন্দ করে তুহিন। এই মহিলা কি তা সে সেই ওখানেই চুমু খেয়েছেন। কিন্তু খেলে তাকে জানাবেন কেন। বোঝাই যাচ্ছে তুহিনের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়েছে, তাই এই ফোন করেছেন। কিন্তু সম্পর্ক খারাপ হলে চুমু খেয়েছেন কি করে?

কিন্তু তুহিন? তুহিন ওই মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করেছে? একথা সে একবারও টের পায়নি? তুহিন তাকে প্রতারণা করেছে? ও রিসিভার নামিয়েই সঙ্গে সঙ্গে তুহিনের অফিসের নাম্বার টিপলো। রিং হচ্ছে। না, তুহিন নয়, ওর সহকারী ধরল। বলল, 'সাহেব আড়াইটের সময় বেরিয়ে গিয়েছেন জরুরী কাজে।'

ফোন রেখে দিল সুবর্ণা। আড়াইটের সময় কোথায় গিয়েছিল? যেখানে গিয়েছিল সেখানেই কি ওই মহিলা থাকে? সেই মহিলাই নিশ্চয়ই ওর গলার পাশে লিপস্টিকের ছাপ ফেলেছে। শুধু গলার পাশে? হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সুবর্ণা। কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়ল সে। আর তখনই কলিংবেল বাজল।

সঙ্গে সঙ্গে শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেল। তুহিন এসেছে। অদ্ভুত ভয় করতে লাগল সুবর্ণার। কি বলবে সে তুহিনকে ওর গলায় যদি লিপস্টিকের দাগ থাকে তাহলে কি আর তার পক্ষে এ বাড়িতে থাকা সম্ভব হবে। পৃথিবীটা কিরকম টলতে শুরু করতেই দ্বিতীয়বার বেল বাজল। কিন্তু উঠে দরজা খোলার জন্যে একটুও শক্তি নেই শরীরে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। তৃতীয়বার বেল বাজল। নাঃ, উপায় নেই। চোখমুছে শক্তমনে দরজা খুলল সুবর্ণা। তার চোখ মাটিতে। একটু দৃষ্টি সরাতেই সে অবাক হয়ে গেল। শাড়ির পাড়? সে মুখ তুলতেই সুপর্ণাকে দেখতে পেল। সুপর্ণা বিস্মিত হয়ে তাকে দেখছে। সুপর্ণা তার থেকে দেড় বছরের বড় দিদি।

'কিরে? তোর কি হয়েছে?' সুপর্ণা দরজায় দাঁড়িয়ে।

নিঃশ্বাস ফেলল সুবর্ণা, 'কই, কিছু না।'

ঘরে ঢুকল সুপর্ণা, 'কাঁদছিলি?'

'কে বলল?'

'কে আর বলবে? তোর মুখ বলছে! কি ব্যাপার?' সুপর্ণা ঘরে ঢুকল।

'কিছুই হয়নি।' দরজা বন্ধ করল সুবর্ণা।

'মিথ্যে কথা বলছিস।' তিন-তিনবার বেল বাজাতে হল তারপর দরজা খুললি। মুখের অবস্থা একেবারে হাঁড়ি করে রেখেছিস, তুহিনের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?'

সুপর্ণা চেয়ারে বসল।

'নাতো!'

'তাহলে?'

'আমার কিছুই হয়নি।'

'হয়নি বললে তো শুনব না, মুখ বলছে তোর মারাত্মক কিছু হয়েছে।'

কষ্ট করে হাসার চেষ্টা করল সুবর্ণা, 'দূর! তুমি এখন?'

'আর বলিস না, তোদের পাড়ায় নতুন যে বুটিকটা হয়েছে ওটার মালিক আমার এক বান্ধবী। অনেকদিন ধরে বলছিল ওর বুটিকে যেতে। ভাবলাম তোকে নিয়ে যাব, তাই এলাম।' সুপর্ণা চারপাশে তাকাল।

'আজ তুমি একা যাও, আমার শরীরটা ভাল নেই।'

'সেটা বুঝতে পারাছি। শোন, স্বামীর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি হয়ই। কিন্তু অভিমানের সময়টা কখনই লম্বা হতে দিবি না। তাহলে কিন্তু ফল ভাল হবে না।'

'আমার তো ওর সঙ্গে কোন ঝামেলাই হয়নি।' সুবর্ণা বলামাত্র আবার বেল বাজল। চমকে তাকাল সে দরজার দিকে। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কি খাবে বল? চা করব?'

'না। এই, শুনতে পাসনি, কেউ বেল বাজালো।' সুবর্ণা মনে করিয়ে দিল।

'তুমি খুলে দাও।'

'আশ্চর্য!' উঠে গেল সুপর্ণা, ডিভানে এসে বসল সুবর্ণা।

সুপর্ণা দরজা খুলেই খলবল করে উঠল, 'এই যে মশাই, কি করেছ?'

তুহিনের গলা, 'আরে আপনি? হোয়াট এ সারপ্রাইজ! কখন এলেন?'

সুপর্ণার গলা, 'এইতো কিছুক্ষণ। কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।'

'বুঝতেই পারছি না। আমি তো কিছু করিনি।'

'তাহলে ওর মুখ গোমড়া কেন?'

সুবর্ণা বুঝতে পারল তুহিন তার দিকে এগিয়ে আসছে। সে মেঝে থেকে চোখ সরাচ্ছিল না। চোখের সামনে এখন তুহিনের জুতো পরা পা।

'কি হয়েছে তোমার? দিদি কি বলছে?' তুহিন জিজ্ঞাসা করল।

অনেক চেষ্টা করে নিজেকে শক্ত করল সুবর্ণা। যা হওয়ার তা দিদির সামনেই হয়ে যাক। সে যে কিরকম প্রতারিত হয়েছে তা দিদি জেনে যাক। সুবর্ণা চোখ তুলতে লাগল। পা, হাঁটু, কোমর, বুক। চোখ তুলতে তুলতে একটু ইতঃস্তত করল সে। তারপর সটান তাকাল তুহিনের গলার দিকে। বুকের ভেতর থেকে কয়েক টন ওজনের পাথরটা আচমকা যেন সরে গেল, 'নাঃ, দাগ নেই। কোন দাগ নেই তুহিনের গলায়।'

'কি দেখছ ওভাবে?' তুহিনের চোখে বিস্ময়।

সঙ্গে সঙ্গে হেসে ফেলল সুবর্ণা, 'কিছু দেখিনি তো।'

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করল তুহিন।

উঠে দাঁড়াল সুবর্ণা, 'কি রকম ঘাবড়ে দিয়েছিলাম বল।' এখন সে স্বচ্ছন্দ।

সুপর্ণা বলল, 'তার মানে? তোর কিছু হয়নি? তুই এ্যাকটিং করছিলি এতক্ষণ আমার সঙ্গে?'

'শুধু আপনার সঙ্গে নয়, আমাকেও ঘাবড়ে দিয়েছিল।' তুহিন বলল।

মাথা নাড়ল সুবর্ণা, 'তাহলে বল, আমি এ্যাকটিং করতে পারি!'

'হ্যাঁ। পারিস। টিভি-নাটকে করলে খুব নাম হবে। কি মেয়েরে বাবা, আমাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। যাক গে, আমি এখন উঠছি রে।' সুপর্ণা বলল।

'সেকি? এখনই উঠবেন কেন? চা খেয়েছেন?' তুহিন জানতে চাইল।

'না না, চা খাবো না। একটা জায়গায় যেতে হবে, বেশি দেরি করা যাবে না।'

সুপর্ণা দরজার দিকে এগোল। তুহিন বলল, 'চলুন, তাহলে আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।'

সুপর্ণা আপত্তি করল, 'না, না, আমি একাই যেতে পারব।'

'আমি বড় রাস্তা পর্যন্ত সঙ্গে থাকলে আপনার কি অসুবিধে হবে?'

'বেশ, চল। এই আমি আসছি রে।' শেষ কথাটা সুবর্ণাকে বলে দিদি বেরিয়ে গেল, সঙ্গে তুহিন। দরজা বন্ধ করল সুবর্ণা।

মহিলাটি কে? এইরকম ভয়ঙ্কর কোন মহিলার কথা সে জানে না। শুধু শুধু তার মনে সন্দেহ দিয়ে দিয়ে সম্পর্কটাকে বিষাক্ত করে দিতে চেয়েছিল। অতখানি ভেঙে পড়েছিল বলে এখন খুব লজ্জা লাগছিল সুবর্ণার। ও আবার আয়নার সামনে যেতেই টেলিফোনটা শব্দ করে উঠল। যন্ত্রটার দিকে তাকাল সে। তারপর এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলল, 'হেলো!'

'মন ঘুরে গেল?' খসখসে গলায় হাসি।

'আপনি কে? কে আপনি?' চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল সুবর্ণা।

'গালে যেই দাগটা দেখতে পাওনি অমনি তোমার মনে হল আমি মিথ্যে কথা বলেছি। ছেলেগুলোর ধূর্তামি এদেশের মেয়েরা যে কেন ধরতে পারে না! আরে বাবা, লিপস্টিকের দাগ তো তোমার স্বামী রুমালে মুছে ফেলতে পারে। টের পেয়েছে নিশ্চয়ই গলায় দাগটা আছে। আমরা মেয়েরা দুদুটো রুমাল নিয়ে বের হই, ছেলেরা তো একটার বেশি সঙ্গে রাখে না। চেক করো, ঠিক প্রমাণ পেয়ে যাবে। বোকা মেয়ে।' লাইনটা ওপাশ থেকে কেটে দেওয়া হল।

একথাটা তো তার মাথায় আসেনি। লিপস্টিকের দাগ রুমালে মুছে ফেললে গলায় থাকবে কি করে? কিন্তু অবশ্যই রুমালে লেগে থাকবে। সহজে উঠবে না। আবার বুকের ভেতর মেঘ জমতে শুরু করল। নাঃ, এর হেস্তনেস্ত না করে সে ছাড়বে না।

মিনিট দশেকের মধ্যেই তুহিন ফিরল। দরজা খুলল সুবর্ণা। খুলেই জিজ্ঞাসা করল, 'আজ কখন অফিস থেকে বেরিয়েছিলে?'

'দুপুরে। কেন?'

সত্যি কথা তুহিন বলবে ভাবেনি সুবর্ণা। ভালও যেমন লাগল, অস্বস্তিও হল। সে সোফায় বসে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

'কি ব্যাপার বল তো?' তুহিন মুখোমুখি বসল।

'উত্তর দিতে অসুবিধে থাকলে বলে দাও।'

'অসুবিধে হবে কেন? এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম। চেয়ারম্যানকে রিসিভ করতে।' তুহিন বলল।

'ও।' থিতিয়ে গেল সুবর্ণা।

'বুঝতে পেরেছি। অফিসে ফোন করেছিলে?' তুহিন এবার হাসলো, 'ওরা বলেনি?'

'না।'

'আমি ভেবেছিলাম আজ বাড়ি ফিরতে রাত হবে। চেয়ারম্যান নিশ্চয়ই সোজা অফিসে ঢুকবেন। কিন্তু মিসেস চেয়ারম্যানের মাথা ধরায় তিনি তাঁকে নিয়ে গেস্ট- হাউসে চলে গেলেন। কাল সকাল সাড়ে ন'টা থেকে কাজ শুরু করবেন।'

তুহিন বলল।

'ও।'

'চা খাওয়াবে না?'

'দিচ্ছি।'

তুহিন উঠল। বেডরুমে চলে গেল। কিচেনে ঢুকল সুবর্ণা। মুখোমুখি বসে রুমালটা সে চাইতে পারল না। কিন্তু রুমালটা দেখতেই হবে। অফিস্ থেকে বাড়ি ফিরে আণ্ডার গার্মেন্টস রুমাল বাস্কেটে ফেলে দেওয়া রেওয়াজ। আজ নিশ্চয়ই ও রুমাল ধুতে যাবে না। গেলেও রঙটা কি পুরো উঠবে! তখনই তো প্রশ্ন করা যায় আজ হঠাৎ রুমাল ধোওয়ার প্রয়োজন হল কেন?

টেবিলে চা আর জলখাবার দিতেই তুহিন এসে বসল পাজামা পাঞ্জাবি পরে। টেবিলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি খাবে না?'

'আমি শুধু চা খাবো। তুমি শুরু করো, আমি আসছি।' বলে সে বেডরুমে চলে এল। বাথরুমের ডানদিকে বাস্কেটটায় তুহিনের আণ্ডার গার্মেন্টস পড়ে আছে। হ্যাঁ, রুমালটাও রয়েছে। বাঁ হাতে সেটাকে তুলে মুখের সামনে ধরল। এবার অন্য হাত লাগালো। না। কোথাও এক ফোঁটা দাগ লেগে নেই। একদম নতুন রুমাল। দাগ লাগলে উঠতো না সহজে।

আবার স্বস্তি। সে বাইরে বেরিয়ে এল।

তুহিন জিজ্ঞাসা করল, 'আজ কি অনেক বেলায় লাঞ্চ করেছ?'

'হ্যাঁ-না।'

'কি হ্যাঁ-না বলছ?'

'না। এখনি খাবো না। ভাল লাগছে না।'

'কি হয়েছে বলতো?'

'কিছুই হয়নি।'

সুবর্ণা কথাটা বলামাত্র টেলিফোন বাজল। চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল তুহিন। সুবর্ণা বাধা দিল, 'আমি দেখছি, তুমি খাও।'

এ যদি তার ফোন হয়? রিসিভার তোলার সময় ইচ্ছে করে তুহিনের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল সুবর্ণা, 'হেলো।'

'রুমালে দাগ নেই, তাই তো? আচ্ছা এটা কি সেই রুমাল যেটা নিয়ে তোমার স্বামী সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। বোকা মেয়ে! পুরনো রুমালটায় রঙ লেগেছে দেখে সেটা ফেলে দিয়ে নতুন একটা রুমাল কিনে পকেটে রাখতে পারে তো। তাই না!' লাইন কেটে গেল। অনেক কষ্টে নিজেকে শক্ত রেখে রিসিভার নামাল সে।

দূর থেকে তুহিন জিজ্ঞাসা করল, 'কে?'

'কেউ নয়।'

'কেউ নয় অথচ এতক্ষণ কার কথা শুনলে?'

কথাটার জবাব না দিয়ে সামনে বসল সুবর্ণা, 'আজ তুমি নতুন রুমাল ব্যবহার করেছ?'

'হ্যাঁ।'

'কখন কিনলে?'

'কখন মানে? গত সপ্তাহে তুমিই তো দুটো একই ধরনের রুমাল কিনেছিলে আমার জন্যে।'

মনে পড়ল। সত্যি সে দুটো রুমাল কিনেছিল গত সপ্তাহে। একই রকম দেখতে দুটো রুমাল। বাথরুমের বাস্কেটে যে রুমালটা পড়ে আছে তার জোড়া রয়েছে ওয়ার্ডরোবে। তাহলে? সমস্ত ব্যাপারটা গুলিয়ে গেল এবং আচমকা কেঁদে ফেলল সুবর্ণা।

তুহিন অবাক হল। স্ত্রীর মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে সে বাড়িতে ঢুকেই বুঝতে পেরেছিল? বেশী না খুঁচিয়ে অপেক্ষা করছিল কখন ও নিজে থেকে সব কথা খুলে বলে। এখন এই কান্না দেখে তুহিন উঠে এল সুবর্ণার পাশে, 'কি হয়েছে?'

'আমি পারছি না, পারছি না।' জোরে জোরে মাথা নাড়ল সুবর্ণা।

'কি পারছ না?'

একটু একটু করে আজ বিকেলে দু'দুবার ফোনে যেসব কথা শুনেছিল তা স্বামীকে বলল সুবর্ণা। পুরোটা শোনার পর তুহিন হাসল।

'তুমি হাসছ?'

'হাস্যকর কথা শুনলে হাসি তো পাবেই।'

'হাস্যময় কথা? আমার বুক ভেসে যাচ্ছে।'

'কেউ বলল তোমার কান কাক নিয়ে গেছে আর অমনি তুমি কাকের পেছনে ছুটলে। একবারও হাত দিয়ে দেখবে না কানটা কানেই আছে কিনা।'

'আমি তো দেখতে চেয়েছি।'

'তাহলে কাঁদছ কেন?'

'শুনলেই বুকটা কিরকম করে?'

'শোন সুবর্ণা, কোন মহিলা ফোনে বলেছিল আমার গলায় লিপস্টিকের দাগ আছে।'

'হ্যাঁ।'

'বাড়িতে আমি যখন ফিরে এলাম তুমি সেই দাগ দেখতে পেলে না।'

'হুঁ।'

'সেই মহিলা আবার বলল নিশ্চয়ই আমি রুমালে দাগ মুছে ফেলেছি। তুমি তাই রুমাল পরীক্ষা করলে এবং সেখানেও কিছু দেখতে পেলে না।'

'হুঁ।'

'আবার সেই মহিলা ফোনে বল্‌ল, আমি পুরোন রুমালে দাগ মুছে নতুন রুমাল কিনে বাড়িতে ঢুকেছি। শুনেই মন ভেঙে গেল, কাঁদলে, পরে বুঝতে পারলে সেই নতুন রুমাল তুমিই আমাকে কিনে দিয়েছিলে। আর দুটো রুমাল পকেটে নিয়ে আমি বের হই না।'

'হ্যাঁ।'

'আমার প্রশ্ন, আমি বাড়ি ফেরার পর তুমি সোজাসুজি আমাকে জিজ্ঞাসা করলে না কেন?'

'আমি কিরকম নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম।'

'তাই ওই মহিলা, যাকে তুমি চেনো না তার কথায় ভুলে গিয়ে আমাকে অবিশ্বাস করতে শুরু করলে। একবার না, তিন-তিনবার।'

'না। আমি চাইছিলাম কথাগুলো মিথ্যে হোক, তাই—'

'আচ্ছা সুবর্ণা, প্রথম ফোনটা এসেছিল যখন আমি বাড়ি ছিলাম না, তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'যে ফোন করেছিল সে জানতো তুমি একা আছো, অন্য কেউ ফোন ধরবে না। কিন্তু আমি যখন বাড়িতে ফিরে এলাম, তোমার দিদিও ছিলেন, তখন কিন্তু দ্বিতীয় ফোনটা এল না। ওটা এল যখন আমি তোমার দিদিকে এগিয়ে দিতে বাড়ির বাইরে গেলাম। কেন? যে ফোন করছিল সে কি ক্‌রে বুঝল ওই সময় আমি বাড়িতে নেই!'

সত্যি তো। প্রথম ফোনটা আসতেই পারে, দ্বিতীয় ফোনটা এসেছিল তুহিনের না থাকার ফাঁকে। মনে পড়তেই সুবর্ণা বলল, 'কিন্তু শেষ ফোনটা

যখন এসেছিলো তখন তুমি বাড়িতে ছিলে। আমার বদলে তুমিও তো রিসিভার তুলতে পারতে।'

'পারিনি কারণ তুমি খুব তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়েছিলে কথা বলতে। আর যদি ধরতামও তাহলে সে কথা বলত না। কিন্তু আমি ভাবছি ওর দ্বিতীয়বারের ফোনটার কথা। তখন আমি বাড়িতে নেই মহিলা জানল কি করে?' তুহিনকে চিন্তিত দেখাল।

সুবর্ণা সোজা হয়ে বসল, 'বুঝতে পেরেছি, নিশ্চয়ই তোমাকে দিদির সঙ্গে বেরিয়ে যেতে দেখেই ফোনটা করেছে। এছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।'

'তার মানে ওই মহিলা আশেপাশের বাড়িতেই থাকে?'

'তাছাড়া আর কি।' নিশ্চিত গলায় বলল সুবর্ণা।

'কে হতে পারে?'

তুহিনের প্রশ্ন শুনে মুখগুলো মনে করতে চেষ্টা করল। বছর তিরিশের মধ্যে যত মেয়ে অথবা বউ এ বাড়ির আশেপাশে থাকে তাদের মুখ ভাবল। নাঃ। কেউ টেলিফোনে এরকম কথা বলতে পারে না।

একই কথা বলল তুহিন, 'এ পাড়ার কোন মহিলা কেন এইসব বলবেন? স্বার্থ কি?'

'আমি কি করে বলব?' সুবর্ণা তাকাল।

'স্বার্থ না থাকলে শুধু মজা করার জন্যে কি কেউ ফোনে এসব কথা বলে!' তুহিন বলল।

'শোন!' সুবর্ণা নিচু গলায় বলল।

তুহিন তাকাল।

'তোমার সঙ্গে এপাড়ার কোন মেয়ের কিছু ছিল না তো?'

'পাগল। তাছাড়া তুমি কি ভুলে যাচ্ছ এই ফ্ল্যাটে আমরা বিয়ের পর এসেছি।'

'তাহলে অন্য কোথাও?'

'ওঃ।'

'রাগ করোনা। প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছে থাকলেই ওইরকম কথা বলা সম্ভব'।

'বেশ। তাহলে আমি যদি তোমার আগে কারও সঙ্গে প্রেম করে থাকি তাহলে সেই মহিলা এখন এ পাড়ায় এসে আমার গতিবিধি লক্ষ্য করছেন, এটাই বলতে চাও?'

'হতেও পারে।'

'বেশ। চল আমার সঙ্গে। আমরা প্রত্যেকটা বাড়িতে গিয়ে দেখব সেরকম কেউ এসেছে কিনা।' তুহিন উঠে দাঁড়াল।

'ধ্যেৎ। তুমি কি পাগল হয়ে গেলে।' হেসে ফেলল সুবর্ণা।

'তোমাকে শান্ত করতে এছাড়া উপায় কি?'

'ঠিক আছে, তুমি বলো।' সুবর্ণা স্বামীর হাত ধরল।

তুহিন বলল, 'আচ্ছা, গলা শুনে মহিলার বয়স বুঝতে পারলে?'

'না। কিরকম চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলছিল।'

'চিবিয়ে, চিবিয়ে?'

'হ্যাঁ। আর বেশ খসখসে গলা। কথা বলে হাসছিল।'

'হুঁ।'

'তুমি কাউকে চেন নাকি?'

'মানে?'

'এভাবে কথা বলে এমন কাউকে তুমি চেন নাকি?'

'না।' মাথা নাড়ল তুহিন। তারপর বলল, 'একটা কলার আই ডি কিনে আনতে হবে। যেই ফোন করবে তার নাম্বার দেখতে পাওয়া যাবে।'

বন্ধ দরজাটার সামনে বেড়ালটা বসেছিল। সাদা ধবধবে বেড়াল। ভঙ্গীটি বড় আদুরে। এখন সকাল। জানলার কাঁচের ভেতর দিয়ে যে আলো ঢুকছে তাতে বোঝা যাচ্ছে ঘরটি চমৎকার সাজানো। সুন্দর সোফাসেট, ডিভান, একটা বেলজিয়াম কাঁচের আয়না ছাড়া অন্যান্য আসবাব। রুচির ছাপ আছে। আর আছে একটা রিভলভিং চেয়ার। সেটা ডিভানের পাশে।

বেড়ালটা কয়েকবার ডাকল। ঠিক ছ'টা বাজতেই বন্ধ দরজাটা খুলে গেল। ভেতরটা অন্ধকার। বেড়ালটা উঠে দাঁড়াল। ঘরের ভেতর থেকে মহিলা-কণ্ঠ ভেসে এল, 'টিনি!'

শোনামাত্র বেড়ালটা ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটে উঠে পড়ল ডিভানের উপর। উঠে মুখ ফিরিয়ে খোলা দরজাটাকে দেখল। তারপর লাফ দিয়ে রিভলভিং চেয়ারে উঠে বসতেই চেয়ারটা সামান্য ঘুরে স্থির হল। রিভলভিং চেয়ারের সামনে বসে বেড়ালটা তাকাল দরজার দিকে।

এবার দরজায় এসে দাঁড়াল যে তাকে সুন্দরী বললে কম বলা হয়। বছর ছাব্বিশেক বয়স। লম্বা, কনুই পর্যন্ত ঘন চুল, গায়ের রঙ গমের মত। পরনে রাত - পোশাক।

এঘরে এসে মেয়েটি চোখ ঘোরালো, 'টিনি! তুমি খু-উ-ব দুষ্টু হয়েছ। এসো আমার কাছে এসো। কিছুক্ষণ দেখা না হলেই এমন করতে হবে?'

টিনি নড়ল না। তার চোখে সন্দেহ। মেয়েটি ধীরে ধীরে চেয়ারটার কাছে এল টিনিকে কোলে তুলে নিল, 'তুই খুব মিষ্টি। 'বুঝতে পারি তুই—, যাকগে। দুধ খাবি? আয়।'

বোতল থেকে দুধ বাটিতে ঢেলে মেঝের ওপর রাখতেই টিনি এগিয়ে চলে এল খেতে। মেয়েটি দুটো হাত পাখির ডানার মত দুপাশে তুলে একটা পাক দিয়ে নিল। খানিকটা দুধ খাওয়ার পর টিনি মুখ তুলে তার দিকে তাকাতেই সে বলল, 'পেট ভরে খেয়ে নাও। আজ দুপুরে বাড়িতে থাকব না। তখন খিদে পেলে আমার কিছুই করার নেই।'

তারপর সে জানলা খুলে দিল। দিতেই ঘর বেশ আলোকিত হল। এবং তখনই নিচের রাস্তা থেকে সকালের কাগজওয়ালা কাগজ ছুঁড়ে দিল ওপরে। জানলাগলে সেটা পড়ল ঘরের মেঝেতে, মেয়েটি সেটা তুলে নিয়ে কোন কিছু না দেখে বিজ্ঞাপনের পাতায় চলে গেল। উদগ্রীব হয়ে খুঁজতে খুঁজতে একটা জায়গায় স্থির হল। মেয়েটি চেঁচালো, 'এ্যাই টিনি বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছে। আয় এদিকে শোন।'

টিনি একবার মুখ তুলে আবার দুধ খেতে লাগল।

'আপনি যদি মহিলা হন এবং নিজেকে অত্যাচারিত মনে করেন তাহলে নির্ধিধায় নিচেয় ফোন নম্বরে ডায়াল করে এ্যানসারিং মেশিনে আপনার সমস্যার কথা বলতে পারেন। যা কাউকে বলতে পারছেন না অথবা বললেও সুরাহা হচ্ছে না তা আমাকে জানালেন তিনদিনের মধ্যে সমাধানের চেষ্টা করব। এর জন্যে কোন টাকাপয়সা দিতে হবে না। আপনার সমস্যা যথেষ্ট গোপন থাকবে। চিত্রাঙ্গদা। টেলিফোন নম্বর—।' বিজ্ঞাপনটা পড়ে কাগজটাকে রেখে দিল মেয়েটি। তারপর হাসল, কুমারি টিনা, আমাদের দেশের মেয়েগুলো তো সাত চড়ে রা কাড়ে না। এমন ভীতু হয় যে বিজ্ঞাপন পড়ে ভাববে কি জানি বললে যদি কোন বিপদে পড়ি, তাই হয়তো ফোনই করবে না। হয়তো আমি যা ভেবেছি তা কাজেই লাগবে না।'

মেয়েটির কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন বেজে উঠল। সে তাকাল যন্ত্রটার দিকে কিন্তু উঠল না। চারবার রিঙ হওয়ার পর ওটা থেমে

গেল এবং এ্যানসারিং মেশিন চালু হয়ে গেল। না, এখন থেকে সে আর ফোন ধরবে না। এ্যানসারিং মেশিন ভর্তি হয়ে যাওয়ার আগে শুনে নতুন অভিযোগের জন্য জায়গা করে দিতে হবে।

মিনিট দশেক বাদে সে উঠল, টেলিফোনের পাশে রাখা এ্যানসারিং মেশিনের বোতাম টিপতেই মহিলার গলা শুনতে পেল, 'আপনি কে জানিনা, মৃত্যু ছাড়া আমার সমস্যার সমাধান নেই। আমি বিধবা। আমার ভাসুর আমাকে ভোগ করতে চায়। আমি রাজী হইনি বলে সে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমি আমার বোনের বাসায় আছি। ঠিকানা...।'

মেশিনটা বন্ধ করে টিনিকে কোলে তুলে ডিভানে গিয়ে আধশোয়া হল মেয়েটি। তারপর বলল, 'শুনলি তো টিনা। এরকম ঘটনা হাজার হাজার ঘটছে। হয় ভাসুর নয় দেওর। তোকে একটু একা থাকতে হবে। আমি যাই দেখা করে আসি মহিলার সঙ্গে। দ্যাখ, মহিলা ওর সমস্যার কথা বলল কিন্তু নিজের নাম বলল না। এটাই ওদের সমস্যা।'

টিনা একটু উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই মেয়েটি আপত্তি করল, 'আরে না না। এখনই যাচ্ছি না। কি করে যাব বল? একজন যে আসছে। এই এল বলে। চল জানলায় গিয়ে দাঁড়াই।'

মেয়েটি বেড়ালটাকে বুকের ওপর নিয়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। নিচে নির্জন রাস্তা। মেয়েটি বলল, 'টিনি সোনা, এখনই গাড়িটা ওখানে এসে দাঁড়াবে।'

বলতে না বলতেই একটা গাড়ি থামল বাড়ির সামনে।

'গাড়ি থেকে যে নামছে তাকে তুই দুই তিনবার দেখেছিস। তুই আসার আগে ও প্রায়ই আসতো। ভেতরে ঢুকে গেছে ও। এখনই বেল বাজবে। চল, দরজাটা খুলে রাখি।'

দরজাটা ঈষৎ ফাঁক করে মেয়েটি রিভলভিং চেয়ারে গিয়ে বসে চেয়ারটাকে ঘোরাতেই বেল বাজল। মেয়েটি বলল, 'ইয়েস, কাম ইন।'

ঘরে ঢুকল তুহিন, 'দরজা খোলা যে!'

'তুমি আসবে তাই—।'

'আমি আসব তুমি জানতে?'

'গাড়ির আওয়াজ পেলাম।'

'আমার গাড়ির আওয়াজটাকে তুমি আলাদা করে চিনতে পারো?'

'তা পারি।'

কাঁধ নাচালো তুহিন, 'শোন, আমি এখানে এসেছি বাধ্য হয়ে।'

'জানি।'

'না জানো না। আমার স্ত্রীকে টেলিফোনে বিরক্ত করছ কেন?'

'তার মানে?'

'ওর মনে আমার সম্পর্কে সন্দেহ তুমি ছাড়া কেউ ঢোকাতে চাইবে না।'

'তোমার স্ত্রীর মনে সন্দেহ ঢুকলে তিনি কি করবেন?'

'কি করবেন মানে? তুমি কথা দিয়েছিলে আমার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবে না। সন্দেহ যদি প্রবল হয় তাহলে আমাদের জীবন ছারখার হয়ে যাবে। তুমি তাই চাও?'

'তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছ তুহিন। ওখানে বসো।'

'না, আমি এখানে বসতে আসিনি।'

'বেশ। একজনের জীবন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিয়ে আর একজনের জীবন পরম শান্তিতে কাটবে এ কেমন বিচার? এটা কি ঠিক?'

'দ্যাখো, আমি তোমার সঙ্গে ইনভলভ্ড হয়েছিলাম বিয়ের আগে। তখন অনেকগুলো কারণে আমাদের সম্পর্ক ক্লিক্ করেনি। নানান ব্যাপার নিয়ে আমাদের প্রায়ই ঝগড়া হত। তখন আমরা পরস্পরের কাছ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলাম। তখন তুমি যেটা নিয়েছিলে, এখন মানতে পারছ না কেন?'

তুহিন কাতর গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'সরে দাঁড়াতে পেয়ে তুমি বেঁচে গিয়েছিলে, আমি সরে দাঁড়াইনি।'

মেয়েটি হাসল, 'তুমি চোরের মত বিয়ে করেছিলে, করনি?'

'না চোরের মত নয়। তোমাকে না জানানো মানে চোরের মত নয়।'

'আমার কাছে তুমি চোর, কাপুরুষ। বিয়ের পর এখানে এসে নাটক করেছিলে। না, আমি কোন অভিযোগ আর করতে চাইনা। তোমাদের নিয়ে একটু মজা করতে ইচ্ছে করছে, এইটুকু।'

'প্লিজ, ছুটি, আমি তোমার কাছে এ্যাপিল করছি। ও তো কোন দোষ করেনি।'

'করেনি। তাইতো ওকে সাবধান করে দিচ্ছি। ও কাকে বিয়ে করেছে তা চেনাতে চাইছি।'

সোজা হল তুহিন, 'তুমি সত্যি কি চাও?'

'জীবনের সবচেয়ে বড় বোকামিটা করে ফেলেছি, আর কি চাইবো?'

'তুমি ওই ফোন করা থামাবে না?'

'দেখি, ভেবে দেখি।'

'বেশ। আমি যাচ্ছি।' তুহিন দরজার দিকে ঘুরল।

'দাঁড়াও। তুহিন, তুমি কি এখনও আমাকে ভালবাসো?'

তুহিন দাঁড়ালো, তাকালো, 'হঠাৎ?'

'না। ঠিক আছে। তুমি যেতে পারো।' বলল মেয়েটি।

তুহিন বেরিয়ে যেতে সে উঠে দাঁড়াল। দরজা বন্ধ করল। তারপর চলে এল জানলার কাছে। টিনার লোমে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'ভীতু পুরুষমানুষ কিরকম হয় দেখলি? আর একবার দ্যাখ। ওই যে গাড়ির দরজা খুলছে। বিয়ের আগে গাড়িতে ওঠার আগে ওপরের দিকে তাকাতো। তখন হাত নাড়তাম, এখন এখান থেকে সরে যাই, চল।'

আবার টেলিফোন বাজল। চারবার রিঙ হওয়ার পর এ্যানসারিং মেশিন কাজ শুরু করল। সেটা থামতে প্রথম ম্যাসেজটা মুছে দিল ছুটি। এখনই যদি দুটো এসে যায় সারাদিনে কতগুলো আসবে কে জানে! এই ফোনটা তালিকাভুক্ত নয়। কেউ যদি নাম্বার নিয়ে টেলিফোন দপ্তরে খোঁজ খবর করে তাহলে ওরা একমাত্র পুলিশ ছাড়া কাউকে ঠিকানা দেবে না। অতএব কারও এখানে আসার সম্ভাবনা নেই।

পোশাক বদলে নিল। সালোয়ার কামিজ। লম্বা স্ট্র্যাপের ব্যাগটা নিল। তারপর টিনাকে হাতে করে দরজা টেনে দিয়ে বাইরে পা বাড়াল। এই ফ্ল্যাটে সে আছে তিনবছর। তিনবছর আগে চাকরি নিয়ে কানপুর থেকে এই শহরে এসেছিল সে। উঠেছিল একটা পেয়িংগেস্ট হাউসে। তখনই এক সহকর্মী বদলি হয়ে যান বোম্বাইতে। তার ফ্ল্যাট কিঞ্চিত বেশি ভাড়া দিয়ে দখল করেছিল সে। সাতদিন আগে শেষবার অফিসে গিয়ে মাসদুয়েকের ছুটির দরখাস্ত করেছিল ছুটি শারীরিক কারণ দেখিয়ে। অফিস মাত্র এক মাস ছুটি মঞ্জুর করেছে। হাসল ছুটি সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে।

রাস্তায় নেমে সে সটান হাঁটছিল। মহিলা যে ঠিকানা দিয়েছেন সেটা খুব কাছে। এদিকে ট্যাক্সি পাওয়া যায় না সবসময়। একটু এগোতে হবে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল একজন অশক্ত বৃদ্ধা লাঠিতে ভর করে উল্টোদিক থেকে রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করছেন আর ডানদিক থেকে একটা ভ্যান তীব্র গতিতে আসছে। ব্রেক কষলেও দুর্ঘটনা অনিবার্য দেখে সে প্রাণপণে ছুটল। একেবারে শেষ মুহূর্তে বৃদ্ধাকে নিয়ে ফুটপাতে গড়িয়ে পড়ল সে। ভ্যানটা ব্রেক কষছিল কিন্তু থামতে পারল তাদের পেরিয়ে আরও কিছুটা এগিয়ে। দুর্ঘটনা ঘটেনি দেখে ড্রাইভার দ্রুত চলে গেল। বৃদ্ধাকে নিয়ে কোনমতে উঠে

দাঁড়াল ছুটি। বৃদ্ধার লাগেনি। তিনি ওর হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তুমি কে মা? নিজের জীবন বিপন্ন করে আমাকে তুমি বাঁচালে? তোমার এই ঋণ শোধ করব কি করে?'

'এ কি বলছেন? আমি আপনার মেয়ের চেয়ে ছোট।'

'না, না—।' বলতে বলতে বৃদ্ধার নজরে পড়ল পড়ে যাওয়ায় রাস্তার পাথরে লেগে ছুটির ডান হাতের কব্জির নিচে অনেকটা কেটে গিয়ে হাঁ হয়ে গেছে। তিনি চিৎকার করলেন, 'ওঃ, তোমার হাত কতখানি কেটে গেছে। এখনই ডাক্তার দেখাবে চল।'

একপলক দেখে নিয়ে ছুটি হাসল 'ও কিছু হবে না, আপনি এবার যেতে পারবেন তো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ পারব। কিন্তু মা, এতটা ফাঁক হয়ে গেছে তবু রক্ত পড়ছে না কেন?'

'আমার শরীরে রক্ত নেই।' বলে হাসল ছুটি। তারপর আবার হাঁটতে লাগল। বৃদ্ধা হতভম্ব হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। হাঁটতে হাঁটতে ছুটি ডান হাত তুলল। তারপর বাঁ হাতের আঙ্গুল দিয়ে ফাঁক হয়ে যাওয়া জায়গাটা চেপে ধরতেই ওটা জুড়ে গেল। একটু আগে যে কেটেছিল তা বোঝাই যাচ্ছে না।

ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিল সে গলির মুখে। তারপর ঠিকানা মিলিয়ে যে বাড়িটার সামনে পৌঁছালো সেটা একতলা। ভেতরে নিশ্চয়ই জমিজমা আছে কারণ বাইরে থেকেই একটা কাঁঠালগাছ দেখা যাচ্ছে। ছুটি দরজার পাশে বেলের বোতাম খুঁজে না পেয়ে কড়া নাড়ল।

একবার নাড়তেই দরজা খুলে এক বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি চাই?'

ছুটি হাতজোড় করে বলল, 'আমাকে একজন মহিলা এই বাড়ি থেকে ফোন করেছিলেন। তাড়াহুড়ো করে ঠিকানা বলেছিলেন, নাম জানাননি।'

'আপনি কে?'

'আমি একজন সাংবাদিক।'

'নাম বলেনি?'

'হ্যাঁ। বলেছিলেন এটা তার বোনের বাড়ি।'

'অ।' ভদ্রলোক পাশ ফিরলেন, 'বউমা, ও বউমা। দ্যাখো, তোমার বোনের কাছে সাংবাদিক এসেছে।

বৃদ্ধ চোখের সামনে থেকে সরে যাওয়ামাত্র এক মহিলা দেখা দিলেন, 'কি ব্যাপার?'

'একজন মহিলা আমাকে টেলিফোন করেছিলেন—।'

'ও হ্যাঁ। আসুন। বসুন।'

ভেতরে ঢুকে চেয়ারে বসার পর দ্বিতীয় মহিলাকে দেখতে পেল ছুটি, 'আপনি?'

'হ্যাঁ।' মহিলা মাথা নাড়ল।

'আপনি নিজের নাম বলতে ভুলে গিয়েছিলেন।'

'ওর নাম কাজল।'

'বেশ কাজলদেবী, আমার নাম চিত্রাঙ্গদা। আপনি আমাকে এই নামেই ফোন করবেন। আমি আপনার সমস্যার সুরাহা করার চেষ্টা করব।' ছুটি বলল।

কাজলের দিদি জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু কেন করবেন? এতে আপনার স্বার্থ কি?'

'স্বার্থ নিয়ে যারা ভাবে আমি তাদের দলে পড়ি না। যাক গে, আপনার সম্পর্কে আমার জানা দরকার। আপনার স্বামী কবে মারা গিয়েছেন?'

'দু'বছর এক মাস।' কাজল জবাব দিল।

'কি হয়েছিল?'

'জ্বর। প্রথমদিকে এমনি ট্যাবলেট খেত, ডাক্তার ডাকত না। শেষপর্যন্ত আমি ডাক্তারকে নিয়ে আসতেই তিনি বললেন হসপিটালে ভর্তি করতে হবে। সেখানে যাওয়ার একদিন পরে মারা যায়।'

'ছেলেমেয়ে?'

'হয়নি।'

'আপনার স্বামীর ভাই বোন?'

'তিন ভাই। একজন প্রতিবন্ধী। হাঁটতে পারে না, কথাও জড়ানো। বড় ভাই ব্যবসা করে। ভাল অবস্থা। একই বাড়িতে থাকে। ওর তিন মেয়ে। ছেলে নেই। বউ খুব নরম, বোকা। স্বামীর বিরুদ্ধে কথা বলার ক্ষমতা নেই। সে যা বলে ও তাই মেনে নেয়।' কাজল বলল।

'আপনার বাবা মা—।'

'কেউ নেই, এক এই বোনই আছে।' কেঁদে ফেলল কাজল।

'আপনার ভাসুর কি স্বামী বেঁচে থাকতেই আপনাকে বিরক্ত করত?'

'অল্প অল্প। ভাসুর হয়ে বউমার সঙ্গে যা বলা উচিত নয় তাই বলত।'

'যেমন?'

'আমাদের বংশ লোপ পেয়ে যাবে যদি তোমার ছেলে না হয়। তোমার দিদি অপদার্থ। ওর শুধু মেয়েই হয়ে যাবে। এইসব।' কান্না সামলালো কাজল।

'আপনার স্বামীকে কথাগুলো বলেছেন?'

'না। তার দাদার বিরুদ্ধে বলতে লজ্জা লেগেছিল। দাদাকে খুব শ্রদ্ধা করত সে।'

'খুউব?'

'হ্যাঁ। জ্বর হওয়ার পর দাদার দেওয়া ওষুটই খেতো।'

'দাদা তো ডাক্তার নয়, তাই না?'

'না। কিন্তু বাড়িতে কারও অসুখ হলে ভাসুরই ওষুধ দিত।'

'আপনার স্বামী মারা যাওয়ার পর তিনি কি প্রস্তাব দিলেন, নাকি জোর করলেন?'

দুটি প্রশ্ন করমাত্র কাজলের দিদি বলল, 'আপনি কি এসব কথা কাগজে লিখবেন?'

'কাগজে লিখলে কি সমস্যার সমাধান হবে? তাছাড়া তিনি যে ওর ওপর অত্যাচার করেছেন তা প্রমাণ করব কি করে? শুধু ওর কথায় তো বিচারক বিশ্বাস করবেন না।'

'তাহলে?'

'আপনারা ভয় পাবেন না। ওর কথা কেউ জানতে পারবেনা বলুন।'

'একদিন দুপুরে আমার ঘরে এসে বললেন, তোমার এখন ভরা যৌবন। শরীরের যা লক্ষ্মণ দেখতে পাচ্ছি তোমার সন্তান হলে সে ছেলে হবে। এখন থেকে আমি তোমোর ঘরে রাত্রে শোব। যেই তোমার পেটে সন্তান আসবে অমনি তোমাকে আর তোমার দিদিকে আমি দূরে কোথাও পাঠিয়ে দেব সেখানে বাচ্চা হওয়ার পর তোমরা ফিরে আসবে। সবাই জানবে বাচ্চাটা তোমার দিদির। ফলে তোমার কোন দুর্নাম হবে না। বুঝতে পেরেছ?' কাজল চুপ করল।

'আপনি কি বললেন?'

'আমি বললাম, এ আপনি কি বলছেন, ছিঃ, আপনি না আমার ভাসুর।' আমার কথা শুনে তখন উনি চুপচাপ চলে গেলেন। কিন্তু তার কিছুদিন পর থেকে শুরু হয়ে গেল অদ্ভুত ব্যাপার। উনি কাছ থেকে, দূরে থেকে ওঁর শরীর দেখাতে শুরু করলেন।' দুহাতে মুখ ঢকাল কাজল।

'ওর স্ত্রীকে কথাটা জানিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ। সে শুধু কেঁদেছিল। কিছু করার ক্ষমতা তার নেই।'

'তারপর?'

'একদিন তিনি একটা দলিলমত কাগজ এনে বললো তার কথায় যদি রাজী না হই তাহলে ওই কাগজে সই করে দিতে। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি লেখা আছে? উনি বললেন সেটা আমার জানার দরকার নেই। সই করার জন্যে আমাকে বারো ঘণ্টার সময় দিলেন।'

'আপনি এসব কথা দিদিকে জানিয়েছিলেন?'

'প্রথম দিকে বলতে পারতাম কিন্তু ভাসুরের নিন্দে হবে বলে সংকোচ হত। পরে আমার বাড়ি থেকে বের হওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। টেলিফোনেও চাবি দেওয়া থাকত।'

'তারপর?'

'ওই বারো ঘণ্টা শেষ হওয়ার আগে আমার বড় জা ঘরে এল। এসে বলল, আমি যেন ওই কাগজে সই না করি। কারণ কাগজে লেখা আছে আমি স্ব-ইচ্ছায় আমার স্বামীর যাবতীয় অংশ ওকে দান করছি। এই সই করে দিলেই ভাসুর আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে। আমাকে কেঁদে ভেঙে পড়তে দেখে জা বলল, 'সবদিক রক্ষা হয় যদি তুমি ওর আগের কথায় রাজী হয়ে যাও। দাঁতে দাঁত চেপে কয়েক মিনিট কাটিয়ে দিও। তারপর বাইরে গিয়ে বড়জোর এক বছর সময়। সেটা দেখতে দেখতে কেটে যাবে। লোকে জানবে আমার ছেলে কিন্তু তুমি তো জানবে ছেলে তোমার।'

জা'কে বললাম, 'তুমিও একথা বলতে পারছ?'

'মেয়ের মা বলে রোজ লাথি ঝাঁটা খাচ্ছি। না বলে উপায় কি?'

'কিন্তু এসব করেও যদি আমার মেয়ে হয়?'

'সর্বনাশ হয়ে যাবে। ওকথা মুখেও এনো না। বিয়ের সময় তোমার যে ঠিকুজি কুষ্ঠি পেয়েছিল ও সেটা যাচাই করে জেনেছে, তোমার ছেলেই হবে। তাই ক্ষেপে উঠেছিল।'

আমি আর পারলাম না। সেই রাত্রেই পালালাম। ওরা তখন ঘুমাচ্ছিল। পালিয়ে এই বাড়িতে কিভাবে এসেছিলাম তা ঈশ্বরই জানেন। আমি এখন কি করব?' কাজল কাঁদতে লাগল।

ওর দিদি চুপচাপ শুনছিল। বলল, 'আমরা উকিলের কাছে গিয়েছিলাম। ভাসুরের বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ করা যাবে না বলে পুলিশ কেস নেবে না। উকিলবাবু বললেন, সম্পত্তির ভাগ চেয়ে মামলা করা যেতে পারে। কিন্তু

মামলা চালাতে গেলে টাকা দরকার সময়ও লাগবে অনেক। আমাদের পক্ষে ওকে কতটা সাহায্য করা সম্ভব বলুন।'

কাজল বলল, 'আমার আত্মহত্যা করা ছাড়া কোন উপায় নেই।' ওই বাড়িতে ফিরে গেলে ওঁর কথায় রাজী হতেই হবে। তার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভাল।'

কাজলের দিদি বলল, 'হঠাৎ আপনার বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ল। মনে হল যদি এটা কোন প্রতারকের ব্যাপার হয়? তবু ওকে বললাম, ফোন করে দ্যাখ।'

'ঠিকই করেছেন। এবার আপনার ভাসুরের ঠিকানা বলুন।' ছুটি সোজা হয়ে বসল।

কাজলের দিদি বলল, 'কাগজে লিখে দে সব। আমি চা নিয়ে আসি।'

'না না। চা আনার দরকার নেই।' ছুটি আপত্তি করল।

'কেন? চা খান না?' দিদি জানতে চাইল।

'আমার সহ্য হয় না।'

কাজলের লেখা কাগজটা দেখল ছুটি। তারপর উঠে দাঁড়াল। 'দেখি কি করতে পারি। যা হওয়ার দুদিনের মধ্যে হবে। এরমধ্যে ভাসুর যদি এবাড়িতে আসে তাহলে আপনি কিছুতেই তার সঙ্গে দেখা করবেন না। মনে থাকবে?'

কাজলের দিদি বলল, 'এসে দেখুক। আমি ঢুকতেই দেব না।'

'আপনাদের এ বাড়ির ফোন নাম্বারটা উল্টোদিকে লিখে দিন।'

কাজল লিখে দিল।

লোকটাকে দেখল ছুটি। মোটাসোটা, বেঁটে, গায়ের রঙ কালো, মাথায় টাক, একটু ভুঁড়ি আছে। পান খায়। পরনে ধূসররঙা সাফারি স্যুট। গাড়ি থেকে নেমে দরজার বেল বাজালো, সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেল ছুটি। এখন তার পরনে জিনস, সাদা টপ, চোখে রোদ-চশমা। কেউ দরজা খুলতেই ভেতরে পা বাড়াচ্ছিল লোকটা, ছুটি পেছন থেকে ডাকল, 'শুনুন।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না লোকটা। এমন সুন্দরী, লাস্যময়ী যুবতী তাকে ডাকবে এটা কখনই কল্পনা করেনি। গদগদ গলায় বলল, 'বলুন।'

'এটা কি গোবিন্দবাবুর বাড়ি?' ছুটি প্রশ্ন করে হাসল।

'আজ্ঞে। হ্যাঁ। আমিই গোবিন্দ। কি ব্যাপার?'

'ও নমস্কার। আমি আমেরিকায় থাকি। কাল এসেছি। আপনার বাড়ি অনেক কষ্টে খুঁজে বের করলাম। ভেতরে আসতে পারি কি?' ছুটি হাসল।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' পরম সমাদরে গোবিন্দ ছুটিকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার বলুন তো?'

ছুটি বলল, 'আমার মামা আমেরিকায় থাকতেন। তিনি সম্প্রতি মারা গিয়েছেন। মারা যাওয়ার আগে তিনি আমাকে অনুরোধ করেন তার এক ভাইঝি ইণ্ডিয়াতে থাকেন। তাঁকে খুঁজে বের করে জানাতে যে তিনি উইলে তার জন্যে কিছু ডলার রেখে গেছেন। ওর মা-বাবার ঠিকানা মামা জানতেন। আমি সেখানে গিয়ে শুনলাম তারা কেউ বেঁচে নেই। মহিলার বিয়ে হয়েছে এখানে, আপনার ভাই-এর সঙ্গে।'

'ও। তাই নাকি?' গোবিন্দর মুখ শুকিয়ে গেল।'

'এসব ঝামেলার ব্যাপার। নেহাৎ মামার জন্যে করছি। আর এক লাখ ডলার তো কম নয়।'

'এক লাখ ডলার।' গোবিন্দ হাঁ হয়ে গেল।

হ্যাঁ। আপনাদের টাকায় প্রায় আটচল্লিশ লক্ষ টাকা।'

'সর্বনাশ।'

'আর বলবো না। মামা তাকে ছেলেবেলায় দেখেছিলেন অথচ তার জন্যে দরদ উথলে উঠেছিল। তা তিনি কি বাড়িতে আছেন। ডাকুন, বলেযাই।' ছুটি এমনভাবে মাথায় হাত দিল যাতে তার উর্দ্ধাঙ্গে ঢেউ ওঠে। সেটা দেখে গোবিন্দর গলা শুকিয়ে গেল, 'ইয়ে, মানে, তিনি এখন এখানে নেই। আমার ভাই মারা গিয়েছে।'

'ওঃ।'

'হ্যাঁ। তারপর থেকে ওর মাথা ঠিক নেই। অল্প বয়স তো!'

'আর বিয়ে করেনি?'

'না। খুব কোল্ড, বুঝলেন!' হাসল গোবিন্দ।

'কোল্ড। বাঙালি মেয়েদের এই দোষ।'

'যা বলেছেন।'

'আমি এটা পছন্দ করি না। কিন্তু ওকে তো বলা দরকার।'

'নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। আপনি কোথায় উঠেছেন ম্যাডাম?'

'আমায় চিত্র বলবেন। মামা ডাকতেন চিতু বলে।'

'চিতু! বাঃ। কি সুন্দর। এ বাড়িতে এখন কে কে আছেন?'

'কেউ না কেউ না। মানে আমার স্ত্রী-মেয়েরা আছে, ওরা বাপের বাড়ি যাবে।'

'তাহলে হল না।'

'কি হল না ম্যাডাম?'

'আসলে সারাবছর এত হোটেলে থাকতে হয় যে কলকাতায় এসে হোটেলে থাকতে ইচ্ছে করছিল না। ওখানে তো বাঙালি খাবার পাওয়া যায় না। আপনার স্ত্রী যখন থাকবেন না তখন আপনাকে তো বলা যাবেনা—।'

'না না। কেনা চিন্তা নেই। আপনি চলে আসুন। সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।'

'আজ হবে না। সন্ধ্যে ছটায় আমার কাছে একজন আসবেন।'

'এখনও অনেক বাকি আছে দু'টা বাজতে। আর একটু থাকুন না। কি খাবেন, বলুন।'

'কিছু না। আচ্ছা, এত টাকা পেলে উনি কি করবেন?'

'জানি না। হয়তো কোন ছোকরাকে বিয়ে করে চলে যাবেন।'

'সেকি! আপনাদের দেবেন না?'

'ক্ষেপেছেন! অল্প বয়সী বিধবারা ডেঞ্জারাস হয়।'

'তা অবশ্য। এই দেখুন আমি কুমারী, আমারই কষ্ট হয়।'

'কেন? ম্যাডামের কোন বয়ফ্রেন্ড নেই?'

'নাঃ। মনের মত কাউকে পেলাম না। সব রোগা পটকা। যাক গে, তাহলে উনি টাকা পেলে আপনার কোন লাভ হচ্ছে না বলছেন?'

'এক ফোঁটা না।'

'ওকে বলুন না টাকাটা ভাগাভাগি করে নিতে।'

'দেবে না। আমি ওকে হাড়ে হাড়ে চিনি।' গোবিন্দ বলল, 'টাকাটা নিতে কি ওকে আমেরিকায় যেতে হবে ম্যাডাম?'

'না না। এখানে কোর্টে গিয়ে একটা এফিডেবিট করতে হবে। তাতে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট উল্লেখ করতে হবে। মুশকিল হল মামার উইলে ওর কুমারী জীবনের টাইটেল আছে।'

'অ। এ নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না। আপনি রাজী হলে আমি সব ব্যবস্থা করব।'

গোবিন্দর গলার স্বর পাল্টে গেল। যেন আকাশে ভেসে বেড়ানো শকুন মৃতদেহের গন্ধ পেয়েছে।

'তাই?' বাঁ পায়ের ওপর ডান পা তুলল ছুটি।

'আপনি যদি সহযোগিতা করেন।' বারংবার ছুটির বুকের ওপর নজর চলে যাচ্ছিল গোবিন্দর।

'কিন্তু ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার।' ছুটি বলল।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আপনি যদি খুব ইচ্ছে করেন—।'

'আসলে আমি ওঁকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করতে চাই না।'

'তা তো ঠিক।' মাথা নাড়ল গোবিন্দ।

'আপনি অতগুলো টাকার বদলে ওকে কি দিতে পারেন?'

'আমি?' একটু ঘাবড়ে গেল গোবিন্দ, 'আপনি বলুন!'

ছুটি হেসে উঠে দাঁড়াল, 'বাঃ, আমি কি বলব? কি পেলে উনি খুশি হবেন তা আপনি জানেন। আমি এখন চলি। তাহলে কাগজপত্র তৈরী করে আপনি আমাকে কখন দিচ্ছেন?'

'এখন তো', ঘড়ি দেখল গোবিন্দ, 'বিকেলের মধ্যে হয়ে যাবে।'

'বাঃ। আপনি তো বেশ কাজের লোক। আপনার কাছ থেকে কাগজ পাওয়া মাত্র আমি মামার এ্যাটর্নির কাছে পাঠিয়ে দেব। মনে হয় মাখখানেকের মধ্যে আপনি চেক পেয়ে যাবেন।'

'আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আপনার জন্যে কি করতে পারি বলুন।' গোবিন্দ গদগদ।

'আমার জন্যে কিছু করতে হবে না। আপনার বউমার জন্যে কিছু করুন।'

'বেশ। ওর স্বামী আমার ভাই। সে আজ নেই। তার অংশ আমি বউমাকে লিখে দেব। কিন্তু এই ব্যাপারটা যেন তিনি জানতে না পারেন।' গোবিন্দ বলল।

'নিশ্চয়ই। আমি কাল সকালে আবার আসব। আপনি সব কাগজ তৈরী করে রাখবেন।'

'আপনি কেন আসবেন? আমি আপনার হোটেলে চলে যাব।' গোবিন্দ বলল।

শব্দ করে হাসল ছুটি, 'আপনার বাড়িতে আপনাকে দেখতে আমার ভাল লাগবে।'

গোবিন্দ নিজে ট্যাক্সি ডেকে তুলে দিল ওকে।

ছুটন্ত ট্যাক্সিতে বসে ছুটি ভাবছিল। গোবিন্দ লোকটা মোটেই সহজ নয়। সম্পূর্ণ অচেনা একটা মেয়ে বাড়িতে এসে বউমার নামের টাকা ভাসুরকে দিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিল আর লোকটা রাজী হয়ে গিয়ে বউমার নামে সম্পত্তির ভাগ লিখে দেওয়ার প্রস্তাব দিল? না, ব্যাপারটা মোটেই এত সোজা নয়। লোকটা নিশ্চয়ই তাকে বিশ্বাস করেনি। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে অভিনয় করে গেছে।

বাড়িতে পৌঁছে টেলিফোন নিয়ে বসল সে। সদর স্ট্রীটের একটা মাঝারি মাপের হোটেলে টেলিফোন করল। ইংরেজিতে বলল, 'আমি দিল্লী থেকে বলছি। কাল সকালের ফ্লাইটে আপনাদের শহরে যাব। আমি কি আপনার হোটেলে একটা ঘর পেতে পারি?'

'ম্যাডামের নামটা যদি বলেন?'

'চিত্রাঙ্গদা রয়। কম্প্যুটার ইঞ্জিনিয়ার।'

'ওকে ম্যাডাম! আপনার জন্যে লাক্সারি রুম না অর্ডিনারী এসিরুম রাখবো?'

'লাক্সারী রুমের দরকার নেই। আমি একা যাচ্ছি।'

'কদিন থাকবেন?'

'এটা ওখানে গিয়ে জানতে পারব।'

'ঠিক আছে ম্যাডাম, ওয়েলকাম।'

দ্বিতীয় টেলিফোনটা ছুটি করল কাজলকে, 'শুনুন, আমি কাজ শুরু করেছি। কিন্তু গোবিন্দবাবু অথবা তার স্ত্রী অথবা অন্য কেউ যদি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে চায় কেউ এসেছিল কিনা তাহলে কখনই আমার কথা বলবেন না।'

'এখানে কেউ ফোন করে না।' কাজল বলল।

'করে না। কিন্তু করতেও পারে। রাখছি।'

ঘড়ির দিকে তাকাল ছুটি। এখন সাড়ে পাঁচটা। টেলিফোনের বোতাম টিপল। রিঙ হচ্ছে।

'হেলো!' সুবর্ণার গলা।

'কি করছ?' ছুটির গলার স্বর খসখসে।

'কে আপনি?' কেন আমাকে বিরক্ত করছেন?'

'জ্বালায়। জ্বালা বোঝ? বুঝলে বুঝতে পারবে কেন ফোন করছি।'

'কে আপনি? আপনার নাম কি?'

'তোমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করো। একটু পরেই বেল বাজবে। তুমি ছুটে গিয়ে দরজা খুলে যখন ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে তখন আদুরে গলায় জিজ্ঞাসা করলেই পার, আমি কে?' বলেই ফোনটা রেখে দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢাকল ছুটি।

অনেকটা সময় আচ্ছন্নের মত বসে থাকল সে। বেড়ালটা এতক্ষণ রিভলভিং চেয়ারে বসে তাকে লক্ষ করে যাচ্ছিল। এবার সেখান থেকে নেমে এসে তার পায়ে মাথা ঘষতে লাগল। মুখ থেকে হাত সরাল ছুটি। তারপর বেড়ালটাকে কোলে তুলে নিল, 'টিনি, টিনিসোনা। আমার সময় হয়ে এসেছে রে। সারাটা রাত তোকে একা থাকতে হবে। চল, তোকে দুধ খাইয়ে দিই।'

ছুটি উঠল। বোতল থেকে বাটিতে দুধ ঢেলে বেড়ালটার সামনে রাখতেই সে চকচক্ করে খেতে লাগল। সেদিকে তাকিয়ে ছুটি বলল, 'তুই যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হতিস তাহলে তোর জন্যে একটুও মায়া হত না। দূর করে দিতাম। তুই মেয়ে বলেই আমার এত ঝামেলা'।

হঠাৎ সে চমকে ঘড়ির দিকে তাকাল। তারপর দ্রুত ঘরের সব আলো নিভিয়ে শুধু একটা নীল আলো জ্বেলে রেখে ছুটে গেল পাশের দরজার দিকে। দরজাটা খুলে ঘরে ঢুকে গেল সে। বেড়ালটা মুখ তুলে দেখল দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছে। বাকি দুধটুকু শেষ করতে মুখ নামালে বেড়ালটা।

সকাল ছ'টায় দরজা খুলে যেতেই বেড়াল লাফিয়ে রিভলভিং চেয়ারে উঠে বসল। প্রতিদিন এই সময়ে তাকে ভীতু এবং রাগী দেখায়। রাগটা ভয় থেকেই। তারপর ছুটি যখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাসে তখন সে একটু একটু করে সহজ হয়।

আজ তাকে দুধ খাইয়ে দ্রুত একটা স্যুটকেসে কিছু জিনিস ভরে নিল ছুটি। বেড়ালটাকে আদর করল, 'আজ তোকে অনেকক্ষণ একা থাকতে হবে টিনা সোনা। তোকে যে নিয়ে যাব তার উপায় নেই। আমি যে আমেরিকা থেকে আসছি, আমেরিকা থেকে তো বেড়াল সঙ্গে নিয়ে আসা যায় না।'

ট্যাক্সি থেকে নেমে স্যুটকেশ নিয়ে এগোতেই হোটেলের একজন কর্মচারী এগিয়ে এল হাত বাড়িয়ে। তার হাতে স্যুটকেশ ছেড়ে দিয়ে রিসেপশনে

গতকালের টেলিফোনের কথা বলে ঘরে ঢুকে যেতে সময় লাগল মিনিট দশেক। দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকল সে। তারপর স্যুটকেশ থেকে ঢিলেঢালা কালো নাইটি বের করে জামাপ্যান্ট ছেড়ে ওটা পরে নিল। বাঃ, কি আরাম। ঘরের সবক'টা আলো জ্বালিয়ে দিল সে। অন্ধকার সহ্য হয় না তার।

রিং শুরু হল। তৃতীয়বারেই গোবিন্দর গলা পাওয়া গেল, 'হল্লো?'

'গুডমর্ণিং গোবিন্দবাবু। আমি চিতু।'

'ওঃ, চিতু, চিতু। কি সৌভাগ্য। দাঁড়ান দাঁড়ান একটু বসি, হ্যাঁ, আপনি আমাকে টেলিফোন করবেন আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। হেঁ হেঁ, কখন আসবেন?'

হাসল ছুটি। 'না, আমি যাব না।'

গোবিন্দ বিগলিত।

'আসবেন না?' গলার স্বর বদলে গেল গোবিন্দর।

'না। তার বদলে আপনি আসবেন।'

'আমি? হেঁ হেঁ, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, কোথায় যাব? হোটেলে?'

'আর কোথায়? এই শহরে আমার কি থাকার জায়গা আছে?'

'না-না-না, একি কথা। হোটেলটা কোথায় বলুন, আমি এখনই পৌঁছে যাচ্ছি।'

হোটেলের নামধাম ঘরের নাম্বার বলে টেলিফোন রেখে দিল। তারপর রিমোট টিপে টিভি চালু করল। চ্যানেল ঘোরাতে ও ফ্যাশন চ্যানেলে পৌঁছে স্থির হল। লম্বা লম্বা মেয়েকে যন্ত্রের মত হেঁটে আসছে তাদের অঙ্গের পোশাক দেখাতে। বেশীর ভাগেরই বুকের কিছুটা উন্মুক্ত। অন্তত আভাস পাচ্ছে দর্শকরা। মিনিট চারেক দেখলেই খুব একঘেঁয়ে লাগবে। শুধু পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে আবার ফিরে যাওয়া। সুন্দর শরীরে বিভিন্ন ডিজাইনারের তৈরী পোশাক প্রদর্শন করা ছাড়া অন্য কোন ভূমিকা নেই। আর ওই ডিজাইনারদের বেশির ভাগই এমন পোশাক তৈরী করে যে মেয়েদের শরীরের গোপন অংশগুলো দেখা-অদেখার মাঝখানে রহস্যময় হয়ে ওঠে।

ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে দরজায় শব্দ হল। ছুটি এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল।

গোবিন্দ দাঁড়িয়ে আছে ফুলের তোড়া নিয়ে। তার পরনে সিল্কের পাঞ্জাবি এবং আধাচোস্ত পাজামা। মুখে বিগলিত হাসি, 'আসতে পারি?'

'ওয়েলকাম।'

লোকটা ঘরে ঢোকার পর দরজা বন্ধ করে দিল ছুটি। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'এখন টিভিটা বন্ধ করে দিলে আপনার অসুবিধে হবে না তো?'

টিভির দিকে তাকিয়ে এগিয়ে আসা সুন্দরীকে দেখে গোবিন্দ বলল, 'না, না। আপনার কাছে এসে ওদের দেখব কেন? বন্ধ করে দিন।'

টিভি অফ করে ছুটি বলল, 'বসুন।'

গোবিন্দ ফুলটা দিল। দিয়ে চেয়ারে বসল। ছুটি টেবিলে ফুল রেখে বিছানায় গিয়ে বালিশে কনুই রেখে আধশোওয়া হতেই গোবিন্দর চোখ বড় হয়ে গেল। সে ছুটির শরীর থেকে চোখ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারছিল না।

ছুটি বলল, 'কাজটা কতটা হয়েছে গোবিন্দবাবু?'

'এ্যাঁ? একটু মুশকিল হয়েছে। এখন ব্যাঙ্কে এ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে ছবি, রেশন কার্ড দেখতে চায়। আমি ভেবেছিলাম বউমার নামে এ্যাকাউন্ট খুলিয়ে তাতেই চেক জমা দেব।' মাথা নাড়ল সে, 'একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে।'

'আপনার স্ত্রীর নাম কি?'

'লতা।'

'তাহলে এরকম এফিডেবিট করতে পারেন কি যে কাজললতা বিয়ের পর শুধু লতা হয়েছে? ধরুন, কাজললতা সেন বিয়ের পর লতা দত্ত হয়েছে। পারবেন?'

'বুঝতে পেরেছি, উঃ, এটা আমার মাথায় আসেইনি।'

'এখন এল তো।' একটু পাশ ফিরল ছুটি। সঙ্গে সঙ্গে চোখ গোল হয়ে গেল গোবিন্দর। 'এ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু ম্যাডাম—।'

'চিতু।'

'ও হ্যাঁ, চিতু, আপনার সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া তো সম্ভব নয়।'

'হ্যাঁ। এখানেই আমি আসছি। দেখুন গোবিন্দবাবু, সারাজীবন আমি মানুষের অনেক উপকার করেছি। বিনিময়ে কিছুই নিইনি। বোকামি করেছি। এই যে ব্যাপারটা, এটা তো স্রেফ জালিয়াতি। আমেরিকায় গিয়ে এ্যাটর্নিকে বোঝাতে আমাকে কম পরিশ্রম করতে হবে না। পরে যদি প্রমাণিত হয় আমি মিথ্যে বুঝিয়েছি তাহলে আমার পরিণাম কি হবে ভাবতে পারছেন?'

'না না, কেউ টেরই পাবে না।'

'বলা যায় না। শুনুন, আমি ভেবে দেখলাম, আপনার বউমাকে ওসব লিখে দেওয়ার দরকার নেই। এ্যাদ্দিন [illegible], এখন দিলে মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেওয়ার লোকের অভাব হবে না।'

'যা বলেছেন।' খুশী হল গোবিন্দ! আপনি ঠিক কথা বললেন।'

'তাহলে পুরো টাকাটার ড্রাফট আসবে লতার, মানে আপনার স্ত্রীর নামে।'

গোবিন্দ জবাব না দিয়ে হাত কচলাতে লাগল।

'কিন্তু এতসব করার জন্যে আমি ঝুঁকি নেব কেন?' ছুটি চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল, 'ধরা পড়লে আমার অবস্থা কিরকম হবে ভাবতে পারছেন গোবিন্দবাবু?'

'না না ধরা পড়বেন কেন?' নিঃশ্বাস ভারি হয়ে আসছিল গোবিন্দর।

'তবু ঝুঁকি তো নিচ্ছি। ঝুঁকির দাম আপনাকে দিতে হবে।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আপনি আমাকে পাইয়ে দিচ্ছেন, আমি আপনাকে দেব না?'

'কত দেবেন?'

'আপনি যা চান।'

'আমি বেশী চাইব না। আপনি প্রায় আটচল্লিশ লাখ টাকা পাবেন, আমাকে দশ দিতে হবে।

'দশ'! হঠাৎ থমকে গেল গোবিন্দ।

'আপনার পকেট থেকে দিচ্ছেন না। আমি পাইয়ে দিচ্ছি বলে দেবেন। তার পরেই প্রায় আটত্রিশ লক্ষ টাকা আপনার পকেটে ঢুকে যাবে।' ছুটি উঠে বসল।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

'কিন্তু এখানেও একটা মুশকিল।'

'কি?'

'আপনার স্ত্রীর নামে পুরো টাকার ড্রাফট আসবে। আপনি ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে যদি আমার কথা ভুলে যান?'

'ছি ছি ছি। আমি বেইমান নই। ভুলব কেন?'

'হয়তো আপনি নন। কিন্তু অনেকেই যে বেইমানি করে তা নিশ্চয়ই জানেন।'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমি তো তাদের দলে নই।'

'সেটা আপনি জানেন, আমি জানি না। কিন্তু আমি কোন সমস্যায় পড়তে চাই না। যখন আপনি ড্রাফ্‌ট পাবেন তখন আমি আমেরিকায়। আমাকে টাকা দেবেন কি করে?'

বলতে বলতে ছুটি পায়ের ওপর পা তুলতেই নাইটির নিচের অংশ সরে গিয়ে তার পায়ের অনেকটাই প্রকাশিত হল। শঙ্খসাদা মসৃণ চামড়ার দিকে তাকিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল গোবিন্দর। তার কথা বন্ধ হয়ে গেল।

'গোবিন্দবাবু?' ছুটি ডাকল।

'এ্যাঁ? ও হ্যাঁ। আচ্ছা, ড্রাফ্‌ট কবে পাব?'

'আমি কাল ফিরে যাচ্ছি। ধরুন মাস খানেক।'

'এক কাজ করি। আমি অর্দ্ধেক টাকা এখন দিচ্ছি, বাকিটা ড্রাফ্‌ট পেলে দেব। প্লিজ আমাকে বিশ্বাস করুন। আমি আপনাকে বিশ্বাস করছি। আপনি আমাকে করবেন না?'

'ঠকাবেন না তো?'

'মাইরি না। আমি সেরকম মানুষ নই।'

'বেশ। তাহলে নতুন করে এফিডেবিট এনে দিন।'

'দু'ঘণ্টার মধ্যে এনে দিচ্ছি।'

'গুড। তাহলে আজ রাত্রে আমার হোটেলে খেয়ে যাবেন। সেলিব্রেট করা যাক, কি বলেন? আপনি স্কচ খেতে ভালবাসেন?' মুচ্‌কে হাসল ছুটি।

'এ্যাঁ? হ্যাঁ, ওঃ, দারুণ হবে।'

'তাহলে কখন আসছেন?'

'সন্ধ্যের সময়।'

'না। সন্ধ্যে নামলে ব্যবসার কথা নয়, তখন অন্য কথা। আপনি তো বললেন ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আপনি কাগজ পেয়ে যাবেন।'

'হ্যাঁ। বেশ। কিন্তু তারপর?'

'তারপর আর বাড়ি যেতে হবে না।'

'এখানেই থাকব?'

'হ্যাঁ। সারা দুপুর বিকেল গল্প করে রাত্রে ডিনার করতে যাব।'

'ওঃ। আমি ভাবতে পারছি না। আমি এখনই আসছি।' গোবিন্দ চলে গেল।

পুরুষমানুষ কখনও কখনও শারীরিক আবেগের প্রাবল্যে যুক্তি হারিয়ে ফেলে, বাস্তব ভুলে যায়। আড়াইটার পরে যখন গোবিন্দ ফিরল তখন বোঝা

গেল তার স্নান খাওয়া হয়নি। গোবিন্দর হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ। তখন নাইটি পাল্টে হাউসকোট পরেছিল ছুটি। সেদিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে গোবিন্দ বলল, 'দেখুন, কথা রেখেছি।' ব্যাগ খুলে স্ট্যাম্পড পেপার বের করল সে।

ছুটি পড়ল সেটা। ঠিক যেমনটি কথা হয়েছিল তেমনটি লিখে কোর্ট থেকে সই করিয়ে এনেছে গোবিন্দ। সে গোবিন্দর দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ হাত বাড়িয়ে সরিয়ে নিতেই গোবিন্দ এগিয়ে আসতে চাইল। ছুটি বলল, 'উঁহু, এখন নয়। প্লিজ। আমারটা—।'

ব্যাগ থেকে পাঁচশো টাকার বাণ্ডিলগুলো বের করে দেখালো। মোট দশটা বাণ্ডিল তার মানে পাঁচ লক্ষ টাকা।

ছুটি বলল, 'আপনার তো সারাদিন কিছুই খাওয়া হয়নি। আমি রুম সার্ভিসকে বলছি ঘরে খাবার দিয়ে যেতে। যান, স্নান করে আসুন। টয়লেটে সব আছে।'

হতভম্ব হয়ে গেল গোবিন্দ, 'স্নান?'

'এত পরিশ্রম করেছেন যে শরীর থেকে ঘামের গন্ধ বের হচ্ছে। আমি ওটা সহ্য করতে পারি না।'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। স্নান করলে আমারও আরাম হবে।'

'আপনি আমিষ না নিরামিষ? কি খাবার বলব?'

'আমিষ।'

'ঠিক আছে।' টেলিফোন তুলল ছুটি, 'একটু রুম সার্ভিস দিন।'

ওকে কথা বলতে দেখে গোবিন্দ টয়লেটে ঢুকে গিয়ে দরজা বন্ধ করতেই টেলিফোনের লাইন কেটে দিল ছুটি। দ্রুত পোশাক পাল্টে নিল। তারপর একটা প্যাকেটের মধ্যে পাঁচশো টাকার দশটি বাণ্ডিল ভরে বেরিয়ে এল বাইরে। তার স্যুটকেশ, নাইটি পড়ে থাকল ঘরে। থাক। ওগুলো খুঁজলে কেউ তার সন্ধান পাবে না। যেন বেড়াতে যাচ্ছে এমন ভাবে হেঁটে সে হোটেল থেকে বেরিয়ে হাঁটতে লাগল ফুটপাত ধরে। হোটেলের সামনে থেকে ট্যাক্সি নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। মোড়ের কাছে পৌঁছে একটা ট্যাক্সি নিল সে। মাঝ রাস্তায় গিয়ে সেটা ছেড়ে দিয়ে আর একটু অপেক্ষা করে দ্বিতীয় ট্যাক্সি নিয়ে সোজা কাজলের বাড়ি পৌঁছে গেল।

দরজা খুলে তাকে দেখে ওরা অবাক।

ছুটি হাসল, 'আপনার জন্যে খুব বেশি কিছু করতে পারিনি। আপনি একা। এখানে পাঁচ লক্ষ টাকা আছে। এটা নিয়ে জীবনটাকে নতুনভাবে শুরু করুন।'

'পাঁচ লক্ষ?' কাজল আর তার দিদি একসঙ্গে বলে উঠল।

'হ্যাঁ। কাউকে জানানোর দরকার নেই। ছোটখাটো কোন দোকান বা শাড়ির ব্যবসা, যা হোক কিছু করতে পারেন। আচ্ছা চলি।' ছুটি উঠে দাঁড়াল।

'কিন্তু এত টাকা আপনি কেন দিচ্ছেন?' কাজল বলল।

'কারণ আপনি ভেঙে পড়েছেন, আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন।'

'কিন্তু আপনার কাছ থেকে আমি কেন টাকা নেব?'

'টাকাটা আমার নয়। আপনার। আপনার স্বামীর সূত্রে সম্পত্তির যে ভাগ তার দাম কত আমি জানি না। আপনার ভাসুর সেটা দিতেন না। তাই তার কাছ থেকে অন্য উপায়ে আমি টাকাটা যোগাড় করেছি। লম্পট পুরুষদের যে শাস্তি পাওয়া উচিত এটা অবশ্য তার অনেক কম। আচ্ছা, 'চলি ভাই।' দরজার দিকে এগোল ছুটি।

কাজল বলল, 'আমি ভাবতেই পারছি না আপনি কিভাবে ওর কাছে টাকা পেলেন?'

'চোরের ওপর বাটপাড়ি করে। টাকাটা যেন বেহাত না হয়, দেখবেন।'

'আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আপনি মানুষ নন—'

ছুটি আর দাঁড়াল না।

নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকে সে ঘড়ি দেখল। এখন সাড়ে চারটে। তকে দেখেই টিনা ছুটে এল। কোলে তুলে নিয়ে ইজিচেয়ারে বসল ছুটি, 'বুঝলি টিনা, আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি, গোবিন্দ বাথরুম থেকে বেরিয়ে আমাকে না দেখে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছিল। স্যুটকেশ আছে বলে ভেবেছিল আশেপাশে কোথাও গিয়েছি। তারপর সন্দেহ করেছিল। ব্যাগে টাকা নেই, এফিডেবিট পড়ে আছে দেখে বুঝে গিয়েছিল সে। ছুটে গিয়েছিল রিসেপশনে। আমার ঠিকানা জানতে চেয়েছিল ওরা। আমি যে মিথ্যে ঠিকানা নিয়েছি তাই বলতে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে। হোটেলের লোকজন ব্যাপারটা কি হয়েছে জানতে চাইলে ওর বোধবুদ্ধি ফিরে আসে। ওর স্ত্রীর নামে জাল এফিডেবিট করেছে একথা পুলিশ জানলে বিপদে পড়বে বুঝে সমস্ত ব্যাপারটা চেপে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেছে।'

টিনা মন দিয়ে কথাগুলো শুনছিল। এবার ওর কোলে মুখ রাখল। ঘড়ি দেখল ছুটি। তারপর কর্ডলেস রিসিভারটা তুলে নিয়ে বোতাম টিপলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সুবর্ণার গলা পাওয়া গেল, 'হ্যালো।'

ছুটি হাসল। ওর গলার আওয়াজ খসখসে হল, 'কি হলো? স্বামীর অপেক্ষায় বসে আছ?'

'আপনি আমার স্বামীকে চেনেন?' সুবর্ণা চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'তুমি তোমার স্বামীকে চেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল ছুটি।

'হ্যাঁ, চিনি। আপনি মিথ্যে চেষ্টা করছেন আমাদের সম্পর্ক নষ্ট করতে।' সুবর্ণা বলল।

'আচ্ছা, তোমার স্বামীর পিঠের মাঝখানে যে আঁচিলটা আছে সেটা কবে হয়েছিল?' প্রশ্নটা করে লাইন কেটে দিল ছুটি। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে বিজাতীয় আনন্দের অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। গোটা দিন ছুটির মুখে যে সৌন্দর্য ছিল তা মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল। সেটা দেখতে পেয়ে টিনা লাফিয়ে নেমে পড়ল নিচে। ধাতস্থ হতে সময় লাগল কিছুটা। তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাকে।

আকাশের সব আলো একটু একটু করে নিভে যাচ্ছিল। দিন শেষ হচ্ছে। হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে বসল ছুটি। ঘড়ির দিকে তাকাল। তারপর দৌড়ে দুধের বোতল থেকে অনেকটা দুধ বাটিতে ঢেলে টিনাকে ডাকল, 'টিনা, টিনা!'

টিনা দূরে দাঁড়িয়ে চুপচাপ দেখছিল, ডাক শুনে এগিয়ে এল না।

বিরক্ত হল ছুটি, 'রইল পড়ে। খাওয়ার ইচ্ছে হলে খেও। আমার আর সময় নেই।' দ্রুত জানলাগুলো বন্ধ করে দরজায় হুক তুলে দিয়ে সে ভেতরের দরজার সামনে চলে এল। ঘড়িতে তখন ছ'টা বাজতে এক মিনিট। পাশের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিতেই টিনা গুটি গুটি চলে এল দুধের বাটির কাছে।

মিনিট পনের পরে বেল বাজল। টিনার দুধ খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। চট করে রিভলভিং চেয়ারের ওপর উঠে বসল। দ্বিতীয়বার বেল বাজল। দরজার ওপাশে তুহিন। তার মুখ চোখে বিরক্তি। শেষপর্যন্ত সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল সে। রাস্তায় নেমে গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে তাকাল। জানলা বন্ধ। অর্থাৎ ছুটি বাড়িতে নেই। ঠোঁট কামড়ালো সে। আজ একটা হেস্তনেস্ত করবে ভেবে এসেছিল। সুবর্ণা আজও টেলিফোন পেয়েছে। পেয়ে অত্যন্ত আপসেট। কিন্তু ছুটি কখন বাড়িতে ফিরবে কে জানে। অপেক্ষা করার চেয়ে সুবর্ণাকে বোঝানো অনেক ভাল। গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন চালু করল সে।

ভোরের রোদ কড়া হওয়ার আগেই দরজা খুলে গেল। কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর বেরিয়ে এল ছুটি। আজ ওর পরনে লম্বা স্কার্ট। পুরোটাই নীল। ঘরে পা দিয়ে এক পাক ঘুরে নিয়ে টিনাকে বলল সে, 'আমাকে কেমন দেখাচ্ছে? খুব সুন্দরী? অতিবড় সুন্দরী না পায় বর। আয় দুধ খাবি।'

টিনাকে খাইয়ে সে এ্যানসারিং মেশিন চালু করল। আজ এ্যানসারিং মেশিন অভিযোগে ঠাসা বাঙালি মেয়েরা যেন কাউকে গোপনে জানাতে পেরে মন খুলে কথা বলেছে। বেশীরভাগই অত্যাচারের গল্প। স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ। হঠাৎ একটি মহিলার গলায় অন্যরকম সুর। 'আমি কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করছি না কিন্তু সমস্যায় পড়েছি। এই সমস্যা কিভাবে সমাধান করব ভেবে না পেয়ে আপনাকে বলছি। আমার বয়স বিয়াল্লিশ। লোকে বলে খুব সুন্দরী। আমার স্বামীর ষাট। আমার থেকে আঠারো বছরের বড় কারণ আমি তার দ্বিতীয়া স্ত্রী। তিনি অক্ষম। কোন সন্তান হয়নি। যখন জানতে পারলাম তখন কান্নাকাটি করলেও মেনে নিতে হয়েছিল। কিন্তু এখন এই বয়সে এসে মানতে পারছি না। সেটা ওঁকে বলেছি। শুনে চুপ করে থেকেছেন। আমি সুন্দরী বলে প্রচুর পুরুষ আমার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু আমি অসতী হতে পারব না। আর শরীরের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে যাচ্ছি। আমি কি করব যদি জানান তাহলে কৃতজ্ঞ হব।'

মেশিন বন্ধ করল ছুটি। তারপর টিনার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'এটা নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই। কি বলিস টিনা। পৃথিবীতে এর চেয়ে অনেক অনেক বড় সমস্যায় মেয়েরা জড়িয়ে আছে। পরেরটা শুনি।'

'আমার বয়স হয়েছে মা। আশি। ছেলে ছেলের বউ এতকাল বিদেশে ছিল। এখন আমার এখানে এসেছে। এসেই আমাকে ছাদের ঘরে তুলে দিয়েছে। বলেছে এখানে নাকি বেশি হাওয়া। আমাকে নিচে নামতে দেয় না। এই বাড়ি আমার নামে। ব্যাঙ্কে টাকা আছে। আমি মরার পর সব ওরা পাবে কিন্তু ওদের তর সইছে না। সারাক্ষণ বলছে ওদের নামে লিখে দিতে। লিখে দিলে বউমা আমাকে যা হেনস্তা করবে তা এখনই বুঝতে পারছি। তুমি যদি আমাকে রক্ষা কর তাহলে কৃতজ্ঞ থাকব আমার ঠিকানা—।'

মেশিন বন্ধ করে টিনা বলল, 'যাই একটু ঘুরে আসি। বৃদ্ধা মহিলা। নিশ্চয়ই খুব কষ্ট দিচ্ছে ছেলে-ছেলের বউ। আমার মা থাকলে আমি কি তাকে কষ্ট পেতে দেখে সহ্য করতাম?'

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ওই ঠিকানায় পৌঁছে গেল ছুটি। দোতলা বাড়ি। দেখলেই বোঝা যায় অবস্থা ভাল। বাড়ির দরজা বন্ধ। বেল বাজালো সে—।

একটু পরেই একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষ দরজা খুলল। খুলে চারপাশে তাকাল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কে? কে বেল দিল?'

কোন সাড়া এল না। দরজা বন্ধ করে লোকটা গজগজ করছিল, ওর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে?'

'পাড়ার ছেলেগুলো ইয়ার্কি মারছে। বেল বাজিয়ে লুকিয়ে পড়ছে।' স্বামী বলল।

'ওদের সঙ্গে ঝগড়া করো না। ওদের হাতে রাখতে হবে।' স্ত্রী উপদেশ দিল।

'আর হাতে রাখা। বুড়ি তো কিছুতেই রাজি হচ্ছে না।'

'সোজা আঙ্গুলে কি ঘি ওঠে?'

'তার মানে?'

'তোমার মা। কঠিন হলে তোমার লাগবে। কিন্তু আমি বলছি আঙ্গুল বেঁকাও।'

'আহা! তা বলে তো বুড়িকে মারধোর করতে পারি না।' স্বামী বলল।

'তোমাকে মারধোর করতে কে বলেছে। অন্যভাবে তো টাইট দেওয়া যায়।'

'সেটা কি খুলে বল।'

'খাওয়া কমিয়ে দাও। পেটের জ্বালায় জ্বলুক।' স্ত্রী হাসল।

'ওটা তো তোমার ডিপার্টমেণ্ট। যা করার তুমিই করো।' স্বামী বলল।

স্ত্রী বাথরুমে ঢুকল। স্বামী টিভি খুলল। ছাদের ঘর থেকে চিঁচি শব্দ আসছে, 'অ বউমা, খেতে দাও। অ খোকা খেতে দাও।'

স্ত্রীর গলা বাথরুম থেকে ভেসে এল, 'তোমার মাকে চেঁচাতে নিষেধ করো। পাড়া মাথায় করে ছাড়ছে। লোকে শুনলে প্রেস্টিজ থাকবে।'

টিভির জন্যে স্বামীর কানে কথাগুলো ঢুকল না। স্ত্রী বাথরুমের দরজা খুলল, 'শুনতে পাচ্ছ?' এখন তার শরীরে তোয়ালে জড়ানো।

'এ্যাঁ? হ্যাঁ, হ্যাঁ।' স্বামী টিভির শব্দ কমালো।

'কাল রাত্রে আমরা যখন বাইরে বেরিয়েছিলাম তখন তোমার মা নিচে নেমেছিল।'

'কে বলল তোমাকে?' স্বামী জিজ্ঞাসা করল।

'খবরের কাগজটা পাচ্ছি না।'

'বাথরুমে কাগজ নিয়ে কি করবে?'

'ওঃ, বাথরুমের কথা কে বলছে? হঠাৎ মনে পড়ল বলে বললাম।'

'খবরের কাগজ পড়া ওর অনেক দিনের নেশা তো, তাই—।'

'যাক গে, চেঁচাতে বারণ করো।'

'চুপ করে গেছে। স্নান করে ওকে কিছু দিয়ে এসো।'

'না। রাত্রে দেব। বিধবাদের দুবেলা খাওয়া ঠিক নয়।' স্ত্রী বাথরুমের দরজা বন্ধ করল। জলের আওয়াজ হল। স্বামী ঘরে ঢুকে আবার টিভি চালু করল।

রান্না ঘরে তখন রান্না খাবার ঢাকা দেওয়া রয়েছে। ভাত, ডাল, ভাজা, একটা নিরামিষ তরকারি, মাংস, চাটনি, দই। খাওয়া দাওয়া ভালই হয়। মাংসের ঝোল সরিয়ে ফেললে মেনুটা নিরামিষ হয়ে গেল।

বৃদ্ধা বসেছিলেন তার ঘরে। মুখ নিচের দিকে নামানো। তাঁর হাতে কাগজের একটা টুকরো যাতে ছুটির বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল। বৃদ্ধা বিড়বিড় করলেন, 'জানিনা কোন লাভ হবে কিনা, কেউ তো কথা বলল না। আমিই বলে গেলাম। কি জানি।'

বুড়ি কাগজটা একটা বই-এর মধ্যে ঢুকিয়ে পাশ ফিরতেই হতভম্ব হয়ে গেলেন। পরিপাটি করে সাজানো ভাত, ডাল, ভাজা, তরকারি, চাটনি এবং দই থালা বাটি রেখে টেবিলের ওপর রেখে দেওয়া হয়েছে। তিনি মুগ্ধ হলেন, খাটের প্রান্তে চলে এসে ধীরে ধীরে খাওয়া শুরু করলেন, 'আজ এদের একি হল! এত ভাল ভাল খাবার দিয়েছে আমাকে। ওদের মনের পরিবর্তন হল নাকি। তাই খাবার দিয়ে লজ্জায় বলতে পারেনি। দ্রুত খাওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যে খাবার শেষ হয়ে গেল।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে মাথায় তোয়ালে গোল করে বেঁধে স্ত্রী ছাদে এল ভেজা কাপড় রোদ্দুরে মেলে দিতে। দিয়ে কি মনে হতে উঁকি মারল শাশুড়ির ঘরে। চোখ পড়ল শেষ হয়ে যাওয়া থালায়, বৃদ্ধা তখন দই খাচ্ছেন।

'একি? আপনাকে খাবার দিল কে?' চিৎকার করল স্ত্রী।

বৃদ্ধা হাসলেন, 'চিনি জোগান চিন্তামনি। আমার কি ক্ষমতা বল?'

'ন্যাকামি করবেন না? আপনার ছেলে এসে খাবার দিয়ে গেছে, না?'

'তোমাদের লীলা বোঝা দায় বউমা। এই আমায় খাবার দিয়ে গেলে আবার পরক্ষণেই জানতে চাইছ কোত্থেকে খাবার পেলাম। চাটনিটা খুব ভাল হয়েছিল, আমাকে তো কখনও চাটনি দাও না।' শাশুড়ি বললেন।

'চাটনি? আপনাকে চাটনিও দিয়েছে?' স্ত্রী আর দাঁড়াল না। হুড়মুড় করে নেমে এল ছাদ থেকে। টিভিতে একটি ইংরেজি ছবিতে মগ্ন ছিল স্বামী। তার শব্দ ছাপিয়ে স্ত্রীর গলা বাজল, 'আমাকে এভাবে অপমান করার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে?'

'মানে?' হকচকিয়ে গেল স্বামী।

'আমাকে টুপি পরাতে চাও? মায়ের ওপর দরদ উথলে উঠছে? বাড়ি লিখে দেওয়া দূরের কথা, ব্যাঙ্কের একটা পয়সা বোঝাতে দিয়েছে বুড়ি? এরকম শয়তানি সৎমাও করে না। আমি তার খাওয়া কমাচ্ছি, একটু জব্দ হোক সেই চেষ্টা করছি আর তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে খাবার দিয়ে আসছ? ছি ছি।'

'কি? আমি খাবার দিয়েছি?'

'একশবার দিয়েছ। নইলে বুড়ি চব্যচষ্য খায় কি করে? অল্প একটু চাটনি করেছিলাম তা থেকেও ওকে দেওয়া হয়েছে। আমি তোমার কৈফিয়ৎ চাই?' স্ত্রীর হুঙ্কার শোনা গেল।

স্বামী কথা না বলে দৌড়ে ওপরে চলে এল। তখন জল খাচ্ছেন বৃদ্ধা। ছেলেকে দেখে বললেন, 'হ্যাঁরে, দই না তো, অমৃত। বিধবা মেয়েমানুষ, মাছ মাংস তো খাই না, এসব খেলে মন ভরে যায়। কাল থেকে এই দই একটু দিস বাবা।'

'তোমাকে ভাতের থালা কে এনে দিয়েছে? আমি?'

'তুই ব্যাটা ছেলে হয়ে এসব কাজ কেন করবি?'

স্বামী আর কথা বাড়াল না। তরতর করে নেমে এল নিচে, 'মিথ্যে কথা বলার একটা সীমা আছে।'

'মানে?' স্ত্রী ফণা তুলল।

'তুমিই খাবার দিয়ে আমার ওপর দোষ চাপাচ্ছ।'

'কে বলল একথা?'

'মা।'

'মিথ্যেবাদী। এরকম মিথ্যেবাদী বুড়ি আমি জীবনে দেখিনি। চল, আমি দেখাচ্ছি মজা!'

'থাক। আর কথা বাড়াতে হবে না।'

'আমি বাথরুমে ছিলাম। বেরিয়ে দেখি উনি খাচ্ছেন। আমি কখন দিলাম?'

'আমি টিভি দেখছিলাম এই ঘরে বসে, আমি কখন দেব?'

দুজনে চুপ করল কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল কেউ কাউকে বিশ্বাস করছে না।

চুল আঁচড়ে স্ত্রী রান্নাঘরে ঢুকে খাবার টেবিলে গিয়ে খাওয়ার সময় হাঁ হয়ে গেল। ভাতের সসপ্যান থেকে কেরসিনের গন্ধ বের হচ্ছে। মাংসের কোলের ওপর প্রচুর পরিমাণে লবণ ছড়ানো। ডালের পাত্রে জল ঢেলে দেওয়া হয়েছে।

চিৎকার শুরু হল। স্বামী ছুটে এল। স্বামীর দিকে তাকিয়ে স্ত্রী বলল, 'তুমি এত নিচে নামলে? তোমার সঙ্গে এ বাড়িতে থাকা সম্ভব নয়।'

'তার মানে?'

'আজ খাবারে কেরোসিন মেশাচ্ছো, কাল বিষ মেশাবে।'

'কি আশ্চর্য! আমি কেরোসিন মিশিয়েছি?'

'তাহলে কি কেরোসিন আপনা আপনি ভাতের সঙ্গে মিশে গেল?'

'তা যায়নি। কিন্তু সত্যি তো কে মেশালো? মা নিচে নামে নি তো?'

'না। নামেনি। যে নামেনি তার নামে মিথ্যে কথা বলতে পারব না।'

'বিশ্বাস করো, এরকম কাজ করার কথা আমি ভাবতেও পারি না। কোথায় ভুল হয়নি তো?'

'কি বলছ? ভুল করে কেরোসিন মেশাবো, লবণ ছড়াবো, জল ঢালবো। কষ্ট করে নিজে যা রেঁধেছি তা নষ্ট করব?' স্ত্রীর গলায় করুণস্বর।

'ঠিক আছে, পরে ভাবছি। আগে হোটেল থেকে খাবার নিয়ে আসি। খুব খিদে পেয়ে গেছে। আমি যাচ্ছি আর আসছি।' স্বামী বেরিয়ে গেল।

নষ্ট খাবারগুলো ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করে স্ত্রী শোওয়ার ঘরে ঢুকল। ঢুকে দেখল স্বামীর সার্ট মাটিতে পড়ে আছে। এই সার্ট পরে স্বামী কাল বাইরে গিয়েছিল। সেটাকে তুলে রাখতে গিয়ে দেখল বুকের ওপর লালচে দাগ। লিপস্টিকের দাগ ছাড়া আর কিছু নয়। স্তম্ভিত হয়ে গেল স্ত্রী। কি করা যায় মাথায় ঢুকছিল না তার। এত বছর বিয়ে হয়েছে, স্বামীকে সন্দেহ করার কোন কারণ কখনও ঘটেনি। আজ বাড়িতে যা হয়েছে তাও অভিনব। তার মানে এতদিন সম্পর্কটা আসলে কি তা ধামা চাপা অবস্থায় ছিল? স্ত্রী ঠিক করল, আজ একটা হেস্তনেস্ত করবে। সে আলমারি খুলল। বছর পনের

আগে সে স্বামীর এক বাল্যপ্রণয়ীর চিঠি পেয়েছিল। বিয়ের আগের অল্পবয়সী চাপল্য বলে সে ব্যাপারটা উপেক্ষা করেছিল। এই লিপস্টিক সেই মহিলার নয় তো। এতদিন বাদে জাগ্রত হয়েছেন! বিয়ের আগে তাকেও অনেকে প্রেমপত্র দিয়েছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে যেটা ভাল সেটাকে তিনি সযত্নে রেখে দিয়েছেন। স্বামী ও স্ত্রীর বিবাহপূর্ব প্রেমপত্র পাশাপাশি রয়েছে। দুটোকে আজ বের করলেন স্ত্রী। এইসময় বেল বাজল। খাবার কিনে স্বামী ফিরে এসেছেন।

চুলোয় যাক খাবার। আলমারি খোলা রেখে বেরিয়ে এলেন স্ত্রী। বাইরের ঘরে ঢুকে দরজা খুলতেই দেখলো একটি মহিলা দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞাসা করল স্বামী বাড়িতে আছেন কিনা? স্ত্রী নাম জিজ্ঞাসা করতে হেসে বললেন, 'আপনি আমায় চিনবেন না। আপনাদের বিয়ের আগে ওর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। আমার নাম—।' নাম শুনে মাথা ঘুরে গেল স্ত্রীর। হ্যাঁ, এই নাম, স্বামীর বিবাহপূর্ব প্রেমপত্রের নিচে এই নাম রয়েছে। তবু নিশ্চিত হতে মহিলাকে বসতে বলে শোওয়ার ঘরে ছুটে গেলেন চিঠিটা আনবেন বলে। ফিরে এলেন গম্ভীর মুখে, চিঠি হাতে নিয়ে। এসে দেখলেন মহিলা নেই।

দুপুরের জন্যে ভালমন্দ খাবার কিনে স্বামী আসছিল। হঠাৎ এক মহিলা তাকে ডাকল, 'শুনুন।'

সুন্দরী মহিলা। স্বামী দাঁড়াল। মহিলা বলল, 'আপনার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।'

'কে আপনি?' স্বামী জিজ্ঞাসা করল।

'আমাকে চিনবেন না। ভেবেছিলাম আপনার বাড়িতে গিয়ে কথা বলব। কিন্তু এখানেই দেখা পেয়ে ভাল হয়েছে। আমার কথাগুলো আপনার স্ত্রীর সামনে বলতে অসুবিধে হত।'

'কেন বলুন তো? কি ব্যাপার?'

'আমি সাধারণ মেয়ে। আপনার স্ত্রী আমার ঘর ভাঙ্গছে।'

'সেকি?' হাঁ হয়ে গেল স্বামী।

'আমার স্বামীর সঙ্গে তার বাল্যপ্রণয় ছিল। এতদিন পরে সেই প্রেম আবার জেগে উঠেছে। রোজ দুপুরে আপনি যখন অফিসে থাকেন তখন তারা দেখা করে।'

'কি বলছেন আপনি?'

'ঠিক বলছি। আচ্ছা, আপনার বুড়ি মা কি এখনও বেঁচে আছে?'

'হ্যাঁ।' স্বামীর নিঃশ্বাস বন্ধ হল।

'তাকে মেরে ফেলে আপনাকেও সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে ওরা। তা করুক, কিন্তু আমার স্বামী যদি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে থাকতে আরম্ভ করে তাহলে আমার কি হবে বলুন তো? আমি তো ভেসে যাবো।'

'আপনার স্বামীর নাম?' স্বামীর গলা শুকিয়ে গিয়েছিল।

নামটা বলল মহিলা।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল স্বামীর। হ্যাঁ, বিয়ের পর ওই নাম নিয়ে কত হাসাহাসি করেছে সে। স্ত্রী বলত ছেলেটা নেহাতই ক্যাবলা, একতাড়া চিঠি লিখত ওকে, এই কারণে স্ত্রীর বাবা খুব ধমকে ছিল ডেকে নিয়ে এসে।

মহিলা বলল, 'আপনিই আমাকে রক্ষা করতে পারেন।'

স্বামী বলল, 'কোন চিন্তা করবেন না, আমি দেখছি।'

স্বামী হাহা করে বাড়ির উদ্দেশ্যে হাঁটতে লাগল।

বাড়িতে পৌঁছে দেখল বাইরের দরজা খোলা। কি আশ্চর্য! সে তো বন্ধ করেই বেরিয়েছিল। তাহলে কি দুপুরে সে বাড়িতে নেই বুঝে স্ত্রীর পূর্বপ্রেমিক এসেছে। সে আসায় আবেগে অন্ধ হয়ে গেছে স্ত্রী চোর ডাকাতের কথা ভুলে গিয়ে দরজা খোলা রেখেছে!

স্বামী নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকল। না, বেডরুমে ওরা নেই। তারপর আবিষ্কার করল কোন ঘরে স্ত্রীর প্রেমিক তো দূরের কথা, স্ত্রীকেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

ধীরে ধীরে ছাদে উঠে আসতেই সে স্ত্রীর গলা শুনতে পেল, 'আপনার ছেলে আমার সঙ্গে এরকম বিশ্বাসঘাতকতা করবে আমি ভাবতে পারিনি মা। আমার সর্বনাশ করেছে সে।'

বৃদ্ধা বললেন, 'খুব অন্যায় বউমা, খুব অন্যায় কথা।'

স্বামী দরজায় দাঁড়াল, 'ওর কথা একদম বিশ্বাস করবে না মা।'

বৃদ্ধা মুখ ঘোরালেন, 'কার কথা বিশ্বাস করব?'

'আমার কথা। তোমার বউমা দ্বিচারিণী, কুলটা।' স্বামী বলল।

'কি? আমি দ্বিচারিণী? জিভ খসে পড়বে একথা বললে। তুমি নিজে কি? লম্পট কোথাকার।'

'কি? আমি লম্পট? মুখ সামলে কথা বল।'

'কেন বলব? এই জামায় কার লিপস্টিকের দাগ লাগিয়ে এসেছ তুমি?'

'জামায়?' স্বামী হাঁ হয়ে দেখল। জামাটা তার, দাগটাও আছে। 'নিজে বানিয়ে আমার ওপর অন্য দায় চাপাচ্ছ। কি ইতর মেয়েমানুষ।'

বৃদ্ধা বললেন, 'থাক না। অ বউমা, থাক না এসব।'

'কেন থাকবে মা? বিয়ের আগে যার সঙ্গে প্রেম করত সে আজ কি সাহসে আমার সামনে এসে দাঁড়ায় বলুন? সাহসটা তো ওই জুগিয়েছে! তোমার প্রেমিকা এসেছিল? সেই যে যার সঙ্গে বিয়ের আগে প্রেম করতে, আর আমায় বলেছ মেয়েটা গায়ে পড়া ছিল। তোমার কোন টান ছিল না। মিথ্যে কথা। মা, বলুন আমি এখন কি করব?' স্ত্রী ডুকরে উঠল।

স্বামী বলল, 'ওর কথা মিথ্যে। ফালতু। আমি যখন দিনের বেলায় কাজে যাই, তুমি ওপরে থাকো তখন ওর আগের প্রেমিক নাগর হয়ে বাড়িতে ঢোকে। তুমি একথা জানো মা? জানো না। যাতে তুমি দেখে না ফেলো তাই তোমাকে ওপরে চালান করেছে। শুধু তাই নয়, তোমাকে মেরে ফেলার প্ল্যান করেছে।'

'কি? আমি একা মাকে মেরে ফেলতে চেয়েছি?' স্ত্রী ফণা তুলল।

'একা কেন চাইবে? ওই নাগরের সঙ্গে প্ল্যান করেছ। প্রথমে মা, তারপর আমাকে। ওই মহিলা না এলে জানতামই না।' স্বামী বলল।

'মিথ্যে কথা। সব মিথ্যে কথা। কে মহিলা?'

'তুমি যার ঘর ভাঙ্গছ। আজ এসে কান্নাকাটি করল। তোমার বিয়ের আগের প্রেমিকের স্ত্রী। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমাকে এসব শুনতে হল।' স্বামী বলল।

'মিথ্যে কথা। তোমার কাছে কেউ যায়নি।' স্ত্রী উঠে দাঁড়াল।

'আমারটা মিথ্যে নয়। তোমারটা। তোমার কাছেও কেউ আসেনি।'

'এসেছে।'

বৃদ্ধা বললেন, 'কে এসে কি বলল আর তোরা চুলোচুলি করছিস?'

স্ত্রী বলল, 'মা, আপনি নিচে আপনার ঘরে চলুন।'

স্বামী বলল, 'হ্যাঁ, মা তুমি নিচে চল। তুমি নিচে থাকলে দুপুরে কোন লোক বাড়িতে ঢুকতে পারবে না। তুমি আমার মাথার ওপর থাকো।'

স্ত্রী বলল, 'তোমার একার ওপর কেন, আমাকে দেখুন মা। আপনার ছেলেকে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না আর।'

বৃদ্ধার মুখে হাসি ধরল, 'তোমরা যখন বলছ, নিশ্চয়ই যাব বউমা। এখন দুপুরের খাওয়া শেষ করো তো। অনেক বেলা হয়ে গেছে!'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ছুটি। তার মুখে সমস্যা সমাধানের তৃপ্তি। হাত বাড়িয়ে একটা ট্যাক্সি থামিয়ে তাতে উঠে পড়ল সে। বৃদ্ধার সমস্যার আপাতত সমাধান হয়ে গেছে।

বাড়ির কাছাকাছি এসে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে একটা ডিপার্টমেন্টাল দোকানে ঢুকল ছুটি। টিনাকে রোজ দুবেলা শুধু শুধু খাওয়ানো হচ্ছে। ও খুব ভাল বেড়াল তাই মেনে নিচ্ছে। অন্য বেড়াল হলে কবে পালিয়ে যেত। তাহলে সারাটা দিন কথা বলার সুযোগ থাকত না ছুটির।

দোকানে ঢুকে একটা বড়সড় কৌটো কিনল যাতে বেড়ালদের খাবার আছে। সে টাকার বাণ্ডিলটার দিকে তাকাল। অনেক পাতলা হয়ে এসেছে। বেশিদিন আর টানা যাবে না। যাক গে!

হেঁটেই বাড়ি ফিরছিল ছুটি। বাতাসে তার চুলে ঢেউ খেলছিল, হাঁটার ছন্দে শরীর দুলছিল। এইসময় তার কানে মোটরবাইকের আওয়াজ এল। সে মুখ ফিরিয়ে দেখল দেখতে শুনতে ভাল একটি যুবক মোটরবাইক চালিয়ে চলে এল ওর কাছাকাছি, 'হাই!'

ছুটি দাঁড়াল। তার চোখে রোদ-চশমা। মাথাটা হেলিয়ে অপেক্ষা করল পরের গল্পের জন্যে।

'এক্সকিউজ মি! আপনাকে রোজ দেখি, খবর নিয়ে জেনেছি আপনি একা থাকেন, চাকরি করেন, এখন ছুটিতে আছেন। ঠিক তো? আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।' যুবক হাসল।

'এই তো আলাপ হয়ে গেল।'

'আমার নাম, আমাকে সবাই লালা বলে।'

'বাঃ! আমার সম্পর্কে যখন সব তথ্য জানেন তখন নিশ্চয়ই নামটাও অজানা নেই।'

'না। আপনি ছুটি। দারুণ নাম!' যুবক মোটরবাইকেই বসে ছিল।

'তাহলে আলাপ হয়ে গেল। এবার আমি চলি।'

'একমিনিট!' যুবক হাত বাড়াল।

অতএব দাঁড়াতে হল।

যুবক বলল, 'আসলে আমি আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই। আমি যদি আপনার ফ্ল্যাটে যাই তাহলে কি আপনার আপত্তি হবে?'

'একটু ভেবে দেখি।' ছুটি হাসল, 'এই প্রস্তাব অনেকেই আমাকে দিয়েছেন। সবাইকে তো আমার ফ্ল্যাটে ডাকতে পারি না। বুঝতেই পারছেন!'

'এ পাড়ার কেউ কি আপনাকে প্রস্তাব দিয়েছে?'

'হ্যাঁ। অবশ্যই।'

'কে? কোন শালা? সরি, রাগের মাথায় শালা বলে ফেললাম।'

'আপনি বিবাহিত হলে শালা নিশ্চয়ই বলতে পারেন।'

'না, না, আমি বিবাহিত নই। ওই যে মোড়ের বাড়িটা, ওটা আমাদের। আমার বাবা সিমেন্ট কারখানার মালিক। এত দু-নম্বরী টাকা করেছে যে আমাকে চাকরি করতে দিচ্ছে না।'

'বাঃ, আপনি ভাগ্যবান।'

'এ পাড়ায় কে আপনাকে এ্যাপ্রোচ করেছে?'

'কি হবে নাম জেনে। অনেকেই করে। আচ্ছা, এলাম।' আর দাঁড়াল না ছুটি। মনে মনে যতই বিরক্ত হোক মুখে হাসি রেখেছিল। বাড়িতে পৌঁছে ফ্ল্যাটে ঢুকে কৌটোটা রাখতেই টিনা ছুটে এল। তাকে কোলে নিয়ে আদর করতে করতে ছুটি বলল, 'নতুন উৎপাত শুরু হল, বুঝলি টিনা।' আগে ফোনে বিরক্ত করত। এখন সামনাসামনি। যতদিন ও এখানে আসতো, আমরা একসঙ্গে এখান থেকে বেরুতাম ততদিন কেউ বিরক্ত করেনি। ভেবে নিয়েছিল আমি এনগেজ্‌ড। এখন ওর আসা যাওয়া বন্ধ হয়েছে দেখে ভাবছে আমি খোলা ময়দান, ঢুকে পড়লেই হল। ব্যাপারটা ভাবলেই শরীর জ্বলে ওঠে। টুকরো টুকরো করে ফেলতে ইচ্ছে করে।

ছুটির মুখচোখ বিস্ফারিত হল। টিনা লাফ দিয়ে নেমে সরে গেল দূরে। দ্রুত রিসিভার তুলে ডায়াল করল সে। তিনবার রিং হল, চারবার, কেউ ধরছে না। সুবর্ণা বাড়িতে নেই। রিসিভার রেখে দিল ছুটি। দিয়েই আবার তুলল। এবার অন্য নাম্বার। বাজছে। ফোন ধরল তুহিন, 'হেলো।'

'আমি বলছি চিনতে পারছ?' খসখসে গলা ছুটির। কয়েকটা সেকেণ্ড চুপচাপ। ছুটি আবার জিজ্ঞাসা করল, 'চিনতে অসুবিধে হচ্ছে?'

'তুমি! হঠাৎ?' তুহিন শেষপর্যন্ত কথা বলল।

'আমি ভেবে দেখলাম আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি বউ নিয়ে সুখে সংসার করবে আর আমি একা জ্বলে পুড়ে মরব তা হতে পারে না। আজ পাড়ার মস্তান টাইপের ছেলে এসে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইছে। এর জন্যে তুমি দায়ী। তুমি, তুমি, তুমি—' চিৎকার করল ছুটি।

'কিন্তু ছুটি, তুমি তো আমাদের বিচ্ছেদের ব্যাপারে একমত হয়েছিলে। বলেছিলে সম্পর্ক যখন টিকছে না তখন এটাকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার কোন মানে হয় না। বলনি?' তুহিনের গলায় করুণ সুর।

'হ্যাঁ বলেছিলাম। তোমাকে দয়া দেখানোর জন্যে বলেছিলাম। নিজের ওপর লজ্জায় ঘেন্নায় তোমার সঙ্গ সহ্য করতে না পেরে বলেছিলাম।

দু'বছর প্রেম করে তোমার মনে হয়েছিল আমাকে বিয়ে করলে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। তোমার আত্মীয়স্বজনদের ছেড়ে আসতে হবে। তারা কোন খৃষ্টান মেয়েকে বাড়ির বউ হিসেবে মেনে নেবে না। দু'হাজার এক সালে এরকম হাস্যকর কথা শোনার পর তোমাকে নপুংশক ছাড়া কিছু মনে হয়নি আমার। আমি তখন বুঝিনি ওটা নেহাতই অজুহাত ছিল। সুবর্ণাকে পেলে তোমার অনেক কিছু পাওয়া হবে বলে আমাকে কাটাতে চেয়েছিলে। আমি কি রাস্তার নেড়ি কুকুর যে একটা বাড়ি মারলেই কেঁউ কেঁউ করে সরে যাব?'

মুখচোখ বিস্ফারিত, যেন আগুন বের হচ্ছে ছুটির শরীর থেকে।

'ছুটি, এটা অফিস। আমার পক্ষে বেশী কথা বলা সম্ভব নয়।'

'না, কথা বলতেই হবে তোমাকে।' হিস্‌হিসে গলা ছুটির।

'আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে কাল সন্ধ্যের পরে গিয়েছিলাম তুমি বাড়িতে ছিলে না।'

'আমি সন্ধ্যের পরে এখানে থাকি না।'

'তাহলে?'

'আমি তোমার বাড়িতে গিয়ে সুবর্ণার সামনে তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

'ছু-টি!'

'না। কোন মার্সি নয়। তোমার এই সুখের জীবন আমি সহ্য করতে পারছি না। এখন মনে হচ্ছে কেন আমি বোকামিটা করলাম। কেন? কেন।' বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ল ছুটি। কোনরকমে রিসিভারটা রেখে দিল। তাকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখে টিনা এগিয়ে এল পায়ে পায়ে। এসে ছুটির পায়ে মাথা ঘষতে লাগল। কোনরকমে নিজেকে সামলালো ছুটি। বেড়ালটার কাণ্ড দেখে ওর মুখের চেহারা স্বাভাবিক হয়ে এল। দু'হাতে কোলে তুলে নিয়ে বলল, 'তুই আমাকে এত ভালবাসিস টিনা?'

টিনা বলল, 'মিঁউ!'

ছুটি বলল, 'বাসিস? বাসবি তো। তুই তো পুরুষমানুষ নস। পুরুষের বুকে ভালবাসা বুদবুদের মতো। কখন বুদবুদ ফেটে যাবে তার ঠিক নেই। কিন্তু তোরা তো বিশ্বাসঘাতকতা করতে জানিস না। অথচ দ্যাখ, আমরা মেয়েরা কি বোকা! পুরুষের ভালবাসার আয়ু কতটা জেনেও ওদের জন্য কেঁদে মরি! যদি জেনে শুনে বিষ খাই তাহলে দোষ তো আমাদের।' বলতে

বলতে ছুটির চোখ গেল কৌটোর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সে টিনাকে চেয়ারে রেখে উঠে দাঁড়াল. 'একদম ভুলে গিয়েছি। ছি ছি। তোর জন্যে খাবার এনেছি টিনা। বেক্‌ড চিকেন।'

একটা টিন কাটার দিয়ে কৌটোর মুখ খুলে এগিয়ে গেল ঘরের কোণে রাখা টিনার বাটির দিকে। বাটিটা পরিষ্কার। খানিকটা খাবার তাতে ঢেলে সে ডাকল, 'এসো মহারাণী। তোমার মুখে আবার এটা রোচে কিনা দ্যাখো।'

টিনা পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। বাটির কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে শুঁকলো প্রথমে। তারপর খাবারে মুখ দিতেই তার উৎসাহ বেড়ে গেল। লেজ নাড়তে নাড়তে সে গোগ্রাসে খেতে লাগল।

পাশে বসে ছুটি জিজ্ঞাসা করল, 'ভাল লেগেছে? অনেক দাম কিন্তু। বেশীদিন তোকে খাওয়াতে পারব বলে মনে হয় না। যেদিন থেকে আমার রান্না করা বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেদিন থেকেই তোর কষ্ট হচ্ছে তা বুঝতে পারছি। কি করব। আগুনের কাছাকাছি যে কিছুতেই যেতে পারি না।' রিভলভিং চেয়ারে উঠে বসল ছুটি। একমনে টিনার খাওয়া দেখল। খাওয়া যখন শেষ হল তখন সে বলল, 'আজ দুধ দেব না। এরপর দুধ খেলে ঘরের মধ্যে বমি করে রাখবি। বাথরুমটার কি অবস্থা করে রেখেছিস তাতো জানিস না। অনেকদিন ওখানে যাই নি। যা, এবার রাতের জন্যে ঘুমিয়ে পড়।'

ছুটি উঠল। জানলাগুলো বন্ধ করল। দরজার লক টেনে দিল। তারপর ঘড়ির দিকে তাকাল। এখনও পনের মিনিট সময় রয়েছে। মিউজিক সিস্টেমটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অলস ভঙ্গিতে আঙ্গুলের চাপ দিতেই গান বেজে উঠল। সুমনের গলায় আর্জি শোনা গেল, 'তোমাকে চাই! তোমাকে চাই।'

একই গান তিনবার বাজাবার পর মন জ্বলে উঠল। সে টেলিফোনের দিকে এগোতেই ঘড়িতে চোখ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল। দ্রুত পাশের ঘরের বন্ধ দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল। দরজা বন্ধ হল। টিনা লাফিয়ে রিভলভিং চেয়ারে উঠে বসল।

বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল তুহিনকে। দরজা খুলে সুবর্ণার মনে হল মানুষটা সুস্থ নয়। সে উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে তোমার? এমন দেখাচ্ছে কেন?'

তুহিন হাসতে চেষ্টা করল, 'কিছু হয়নি।'

'তোমাকে দেখে কিন্তু তা মনে হচ্ছে না।' ওর হাত ধরল সুবর্ণা।

'অফিসে খুব খাটনি বেড়েছে। টেনসনও।'

'এ চাকরি তাহলে ছেড়ে দাও তুমি।'

'দূর ক'টা দিন, ঠিক হয়ে যাবে।' তুহিন চেয়ারে বসল। তাকে এক গ্লাস জল এনে দিল সুবর্ণা। জল খেয়ে চোখ বন্ধ করল তুহিন, 'আজকেও কি এসেছিল?'

'কি?' ওর হাত থেকে জলের গ্লাস নিল সুবর্ণা।

'ফোন। উড়ো ফোন!' স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না তুহিন।

'না। আজ আসেনি। বোধহয় টায়ার্ড হয়ে গিয়েছে।'

'যে এরকমভাবে বিরক্ত করতে চায়, সে সহজে টায়ার্ড হয় না।'

'যাক গে। মহিলা যে মিথ্যে কথা বলেন তা তো প্রমাণিত হয়ে গেছে। তুমি আর এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন?' সুবর্ণা হাসিমুখে বলল।

'আমার ভয় লাগে সুবর্ণা।'

'ভয়! ভয় কেন?'

'যদি কেউ ফোন না করে সরাসরি এখানে এসে তোমাকে বিরক্ত করে।'

'আসলে বলব আপনি বসুন আমি আমার স্বামীকে আসতে বলছি। এলে কথা বলব।'

'ঠিক, ঠিক করবে।'

'কিন্তু তুমি ভয় পাচ্ছ কেন?'

'এমনি। কোন কারণ নেই।'

'আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?' সুবর্ণা সামনের চেয়ারে বসল।

'বল।'

'আমার আগে যে মহিলার সঙ্গে তোমার প্রেম হয়েছিল তিনি এখন কোথায়?'

'হঠাৎ তার কথা?'

'তুমি বলেছিলে আরও বড়লোক এক ভদ্রলোককে পেয়ে মহিলা তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে বিয়ে করে কলকাতার বাইরে চলে গিয়েছে। কথাটা ঠিক?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে সেই ভদ্রমহিলা তোমাকে ফোন করবে না। যিনি নিজে পছন্দ অনুযায়ী বিয়ে করে সুখে আছেন তিনি কেন অন্য মহিলাকে বিরক্ত করবেন। অবশ্য হ্যাঁ, যদি তার সেই বিয়ে ভেঙে গিয়ে থাকে তাহলে একা হয়ে এমন কাণ্ড করতে পারেন।' সুবর্ণা সিদ্ধান্তে এল।

মাথা নাড়ল তুহিন, 'আমি তো তার কিছুই জানি না।'

'জানার দরকারও নেই। তুমি তোমার মতো থাক। আমিই ওকে শান্ত করব।' সুবর্ণা বলল।

'তুমি? কিভাবে?'

'বলব। কয়েকটা দিন অপেক্ষা কর। শুধু তুমি আমার পাশে থাকো।'

'আমি তোমার সঙ্গে আছি সুবর্ণা। তোমাকে হারাবার ভয়ে সবসময় কাঁটা হয়ে থাকি।'

হেসে ফেলল সুবর্ণা। 'আমাকে হারাবার ভয় কেন মনে আসছে? তুমি তো কোন অন্যায় করোনি। যাও, বাথরুমে যাও। স্নান করে এসো, আমি খাবার তৈরি করছি।'

তুহিন বাথরুমে চলে গেলে পুরোন খবরের কাগজটা বের করল সুবর্ণা। বিজ্ঞাপনটা সেদিনই চোখে পড়েছিল। কিন্তু গুরুত্ব দেয়নি। আজ মনে হচ্ছে এই সুযোগটার ব্যবহার সে করতেই পারে। যদিও এধরনের বিজ্ঞাপনের ওপর তার কোন আস্থা নেই। হয়তো তার সমস্যার কথা জেনে উল্টো চাপ দিয়ে টাকা আদায়ের চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু তেমন কিছু হলে বিজ্ঞাপন বার হওয়ার পর কাগজে এর বিরুদ্ধে খবর ছাপা হত। সেটা হয়নি। বিজ্ঞাপনটা আবার পড়ল সে, 'আপনি যদি মহিলা হন এবং নিজেকে অত্যাচারিত বঞ্চিত মনে করেন তাহলে নির্দ্বিধায় নিচের ফোন নম্বরে ডায়াল করে এ্যানসারিং মেসিনে আপনার সমস্যার কথা বলতে পারেন। যা কাউকে বলতে পারছেন না অথবা বললেও সুরাহা হচ্ছে না তা আমাকে জানালে তিনদিনের মধ্যে সমাধানের চেষ্টা করব। এর জন্যে কোন টাকাপয়সা দিতে হবে না। আপনার সমস্যা যথেষ্ট গোপন থাকবে। চিত্রাঙ্গদা। টেলিফোন নম্বর—!'

তাড়াতাড়ি খবরের কাগজটা ভাঁজ করে রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে মশলার কৌটোগুলোর পেছনে রেখে দিল সুবর্ণা। তুহিন জানতে পারলে অসন্তুষ্ট হবে। বলবে, 'কে না কে বিজ্ঞাপন দিয়েছে আর তুমি আমাদের সমস্যার কথা তাকে জানিয়ে দিলে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর যে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেও সক্ষম হননি তা সমাধান করবে একজন অজ্ঞাতপরিচয় মহিলা? ক্ষেপেছ?'

তুহিনকে তার প্রথম দেখাতেই ভাল লেগেছিল। হাসিখুশি সুদর্শন যুবক। তার এক বান্ধবীর মাসতুতো ভাই তুহিন। আলাপ করিয়ে দেওয়ার পর আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলেছিল, 'ঝট্ করে প্রেমে পড়ে যাস না। গুলি খাওয়া বাঘ কিন্তু।'

'কি যা তা বলছিস নিজের দাদা সম্পর্কে। হোক না মাসতুতো, তবু দাদা তো!'

'দাদা বলেই বলছি। এমন একটা মেয়ে ওর ঘাড়ে চেপে বসেছিল যাকে আমরা কেউ মেনে নিতে পারিনি। সংসার করার জন্যে কোন কোন মেয়ে জন্মায় না, সে-ও তেমনি।'

'তারপর?'

'দাদার কাছে শুনেছি যে আচমকা ঘাড় থেকে নেমে আরও বড়লোক ছেলের ঘাড়ে চাপার চেষ্টা করছে। ফলে দাদা মনে মনে ভেঙে পড়েছে। আমি অনেক অনুরোধ করে নিয়ে এলাম এখানে'।

একটা লোক তার প্রেমিকার জন্যে কষ্ট পাচ্ছে, এখনও প্রেমিকার সাথে দেখা করছে মন ফেরাবার জন্যে, এসব শোনার পর কোন মেয়ের আগ্রহ থাকার কথা নয়। আমারও হয়নি। কিন্তু সেই লোকই যখন দুদিন বাদে ফোন করে আলাপ করার জন্যে ধন্যবাদ জানায় তখন সুবর্ণা খুশী না হয়ে পারেনি। ফলে দেখা হল। ওর কষ্টের কথা শুনতে হল। সুবর্ণা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'যে সম্পর্ক কেউ স্বেচ্ছায় ভেঙে যেতে চাইছে তাকে আঁকড়ে থাকছেন কেন?'

তুহিন বলেছিল, 'আমি বোকামি করছি জানি—।'

সুবর্ণা বলেছিল, 'সত্যি তাই।'

তুহিন বলেছিল, 'এরপরে আমি আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারব না।'

এই একটি কথা টলিয়ে দিয়েছিল সুবর্ণাকে। সে বলেছিল, 'একজনকে দিয়ে সবাইকে বিচার করছেন কেন? হাতের পাঁচ আঙ্গুল কি সমান?'

সমান নয়। সেটা এতদিনে প্রসারিত হয়েছে। তুহিনকে বিয়ে করে এক মুহূর্তের জন্যে অখুশী হয়নি সুবর্ণা। তুহিনও যে খুশী তার প্রমাণ পেয়েছে

নানাভাবে। হঠাৎ এ কি উৎপাত। চা খেতে খেতে সুবর্ণা প্রস্তাব দিল, 'আজকাল তো কত ইলেকট্রনিক যন্ত্র বেরিয়েছে যা দিয়ে কেউ ফোন করলে তার নম্বর বোঝা যায়। একটা কিনে আনো না।'

তুহিনের মুখ শক্ত হল, 'তারপর?'

'যে টেলিফোনটা করছে তাকে ধরা হবে।'

'সে যদি কোন পাবলিক টেলিফোন থেকে বা এস টি ডি বুথ থেকে ফোন করে তাহলে সেই নম্বর পেয়ে কাকে ধরবে? এরকম ফোন কেউ নিজের বাড়ি থেকে করে না।' তুহিন বলল।

সুবর্ণার মনে হল কথাটা মিথ্যে নয়। মহিলা যদি বাড়ি থেকে ফোন করতেন তাহলে মাঝরাতেও করতে পারতেন। মাঝরাত দূরের কথা সন্ধ্যের পরেও ওই ফোনটা কখনও আসেনি। অর্থাৎ মহিলাকে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে যেতে হয় এবং সেখান থেকে টেলিফোনে এসব কথা বলার সুযোগ নেই।

সে বলল, 'সত্যি! ওই মহিলা সন্ধ্যের পর ফোন করে না।'

'কখনও করেনি, না?'

'কক্ষণো না।' সুবর্ণা বলল।

'তাহলে বুঝতেই পারছ!'

'পুলিশকে বললে হয় না?' সুবর্ণা জিজ্ঞাসা করল।

'পুলিশ কি করবে?'

'ওরা তো লাইন ট্যাপ করে অপরাধীদের ধরে থাকে।'

'দূর! তারা বড় বড় ঝামেলা সামলাতে পারছে না আমাদের এই সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবে কেন? ইগনোর কর, ফোন করলে উপেক্ষা কর, গলা শুনলেই রিসিভার নামিয়ে রেখে দেবে, দেখবে একসময় ক্লান্ত হয়ে থেমে যাবে।' তুহিন খুব গম্ভীর গলায় বলল।

একটু পরেই তুহিন, 'যাই ঘুরে আসি' বলে বেরিয়ে গেল। সুবর্ণা সহজ হতে পারছিল না। তার কেবলই মনে হচ্ছিল ওই মহিলার হদিশ পেলে জানতে চেষ্টা করবে কোন জ্বালা থেকে এইরকম যন্ত্রণা তিনি দিচ্ছেন। ইনি যদি সেই মহিলা না হন যিনি একসময় তুহিনকে ত্যাগ করে আরও ধনী ব্যবসায়ীকে বিয়ে করেছেন তাহলে? আর যদি সেই মহিলাই হন তাহলে তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে নদী কখনও পেছন দিকে বয়ে যায় না।

সুবর্ণা উঠল। রান্নাঘরে গিয়ে কাগজটাকে বের করে বিজ্ঞাপনটা দেখল। তারপর টেলিফোনের কাছে এসে ডায়াল করল। রিঙ হচ্ছে। চারবার রিঙ

হওয়ার পর একটি মহিলাকণ্ঠ বলল, 'চিত্রাঙ্গদা বলছি। আপনি যদি বিজ্ঞাপন দেখে আমায় কিছু জানাতে চান তাহলে বিপ্ শব্দ শোনা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। .আপনার বক্তব্য, ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার অতি সংক্ষেপে বলবেন।' কথাটা শেষ হবার পরই বিপ্ শব্দটা শোনা গেল।

সুবর্ণা বলল, 'আমি একজন গৃহবধূ। আমাকে রোজ সন্ধ্যের আগে এক মহিলা টেলিফোনে বিরক্ত করছে, তাকে আমি চিনিনা। তিনি আমার স্বামীকে নিয়ে এমন খারাপ কথা বলছেন যে আমার জীবন বিষ হয়ে উঠেছে। প্লিজ উদ্ধার করুন। আমার নাম সুবর্ণা, টেলিফোন নাম্বার—।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে নিশ্বাস ফেলল সে। তারপর ঘড়ির দিকে তাকাল। এখন সাড়ে সাতটা, ভদ্রমহিলা, যার নাম চিত্রাঙ্গদা, কখন তার সমস্যার কথা শুনবেন? আচ্ছা, শোনার পর যদি তিনি আরও বিশদ জানতে ফোন করেন আর সেই ফোন যদি তুহিন ধরে তাহলে তো খুব রেগে যাবে। সে ঠিক করল যে ফোনই আসুক তুহিনের আগে সে ধরবে।

এইসময় ফোন বাজল ঘরঘর করে। চমকে উঠেছিল সুবর্ণা। তারপর ধাতস্থ হয়ে রিসিভার তুলল, 'হ্যালো।'

দিদির গলা শোনা গেল, 'এই সুবু, শুনেছিস?'

'কি?'

'তোর জামাইবাবু দু'বছরের জন্যে আফ্রিকা যাচ্ছে, কোম্পানী পাঠাচ্ছে।' দিদি বলল।

'সেকি? একা যাচ্ছে না তোমাকে নিয়ে যাচ্ছে?'

'আমি ওখানে গিয়ে কি করে থাকব? মেয়ের স্কুল নেই?'

'তাহলে?'

'একাই থাকতে হবে এখানে। কিন্তু ও বলছে সামনের মাসেই মেয়ের স্কুল ছুটি হলে মাসখানেকের জন্যে ঘুরে আসতে। জঙ্গল দেখা যাবে। আমি মেয়েকে নিয়ে যেতে পারব না। তুই চল আমার সঙ্গে।'

'আমি। দূর! আমার পাশপোর্টই নেই।'

'পাশপোর্টের ব্যাপারটা তোর জামাইবাবু ঠিক করে যাবে, কথা হয়েছে। একমাস তো, তুহিন যেতে পারলে বলুক, না পারলে একটু একা থাকতে পারবে না?'

সুবর্ণা বলতে চাইল, না পারলেও আমি ওকে একা রেখে যেতে পারব না। যে এখন ফোন করছে' আমি না থাকলে সে সাপের পাঁচ পা দেখবে।

অসম্ভব। কিন্তু মুখে বলল, 'দেখি ওর সঙ্গে কথা বলে। ও যদি যেতে রাজি হয় তাহলে তোমাকে জানাবো।'

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এল তুহিন। সে বেশ ধাঁধায় পড়েছে। একটু ঘুরে আসি বলে সে সোজা চলে গিয়েছিল ছুটির ফ্ল্যাটে। ট্যাক্সিতে আধঘণ্টা লাগে। এখন গাড়ি বের করলে সুবর্ণার প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে বলে বের করেনি। ছুটির ফ্ল্যাট বন্ধ ছিল, আলো জ্বলছিল না। জানলাও খোলা নেই। কালও এই অবস্থা দেখে গেছে সে। অথচ ছুটি কলকাতার বাইরে যায়নি। গেলে তার সঙ্গে আজ কথা হত না। তুহিন দারোয়ানের কাছে খবর নিয়েছিল। দারোয়ান ছুটিকে দেখেছে বিকেলের একটু আগে। প্যাকেট হাতে নিয়ে ফিরছিল তখন। কিন্তু আবার বেরিয়ে গেল কিনা বলতে পারল না। ছুটি কখনই রাত্রে বাইরে থাকা পছন্দ করত না। যেখানেই থাক সে সন্ধ্যের মধ্যে ফিরে আসতো। হঠাৎ এতটা পরিবর্তন হয়ে গেল? কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সে ফিরে এল। বাড়িতে যখন ছুটি নেই তখন ফোন করে কি হবে!

ডিনারে বসে সুবর্ণা হেসে বলল, 'একটা জায়গায় বেড়াতে যাবে?'

'কোথায়?' খেতে খেতে তুহিন জিজ্ঞাসা করল।

'আফ্রিকায়।'

'কোথায়?' অবাক হয়ে খাওয়া থামালো তুহিন।

'জামাইবাবুকে আফ্রিকায় কোম্পানি পাঠাচ্ছে। দুবছরের জন্যে। দিদি ফোন করেছিল'।

'আফ্রিকার কোথায়?'

'তাতো জিজ্ঞেস করিনি।'

'তারপর?'

'দিদি বলছিল জামাইবাবু এখন চলে যাবে আর সামনের মাসে বুবানের ছুটি হলে দিদি যাবে। তখন আমাদের সঙ্গে যেতে বলছে।'

'তুমি ঘুরে এসো।'

'তার মানে?'

'আমি এখন ছুটি পাবো না।'

'তাহলে দিদিকে তাই বলে দেব।'

'তুমি তো যেতে পারো, চেঞ্জ হবে।'

'আমি তো চেঞ্জ চাইনি, এই ভাল আছি।'

'তুমি রাগ করলে।'

'মোটেই না। যেতে হলে তোমার সঙ্গে যাব। ব্যাস।'

তুহিন আর কথা বাড়াল না। সুবর্ণা কেন একা যেতে চাইছে না তা সে অনুমান করতে পারছিল। কিন্তু সেকথা মুখে বলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। সুবর্ণাও ভাবল, তুহিন যখন যেতে পারবে না তখন এ ব্যাপারে কথা না বলাই ভাল।

প্রথম রোদ পৃথিবীর বুকে নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। বাইরে বেরিয়ে এল ছুটি। এখন তার পরনে নাইটি। বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দিয়ে দুহাত শূন্যে তুলে আলস্য উপভোগ করল। টিনা বসেছিল রিভলভিং চেয়ারে, বলল, 'ম্যাও।'

ছুটি তাকাল, 'কি হয়েছে?' এমন পেটুক বেড়াল আমি কখনও দেখিনি। সকালে আমায় দেখলে ওর খিদের কথা মনে পড়ে যায়। যখন আমি থাকব না, তখন কি করবি?'

বাটিতে দুধ ঢেলে দিয়ে ডাকল ছুটি, 'আয়।'

দূর থেকে সেটা দেখতে পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল টিনা। ছুটি বলল, 'ও, দুধ দেখে মুখ ঘোরানো হচ্ছে? মাংসের স্বাদ পেয়ে গেছ, না? উঁহু, এই সাতসকালে মাংস খেতে দেব না আমি। এখন এই দুধ খেতে হবে নইলে উপোস করো।'

ছুটি উঠে দাঁড়াল। তারপর টেলিফোনটার পাশে গিয়ে বসল। এ্যানসারিং মেশিনে বোতাম টিপতেই গলা শোনা গেল, 'আমার স্বামী খুব ভালমানুষ। এ যুগে এত ভাল হলে যা হয় তাই হয়েছে। আমার শ্বশুরমশাই বিশাল সম্পত্তি রেখে গেছেন। হঠাৎ আমার এক খুড়তুতো দেওর এসে দাবী করছে ওই সম্পত্তির অর্দ্ধেক তার। সে মামলা মোকদ্দমা করছে না। শুধু আমার স্বামীকে শাসিয়ে যাচ্ছে। আমার স্বামীকে থানায় পাঠিয়েছিলাম, পুলিশ ডায়েরি নেয়নি। আমরা অত্যন্ত বিপদে আছি। আপনার বিজ্ঞাপন দেখে ফোন করছি। আমাদের টেলিফোন নাম্বার—।'

দ্বিতীয় গলা কথা বলল, 'আমি একজনকে ভালোবাসি, বিয়ে করতে চাই। কিন্তু আমার স্বামী ডিভোর্স দেবে না। সে নপুংশক নয় কিন্তু এত

শীতল যে আমি দাম্পত্যজীবনের আনন্দ পাইনি। শুনলাম আদালত আমাকে মুক্তি দেবে না। এ অবস্থায় আপনার সাহায্যপ্রার্থী। আমার নাম—।'

তৃতীয় গলা, 'দিদি আমাকে বাঁচান। আমি মফস্বলের মেয়ে। চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে আবেদন করায় এখন কলগার্লের জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছি। যে লোকটা চাকরি দেবে বিয়ে করবে বলে লোভ দেখিয়েছে তার বউবাচ্চা আছে, পরে জেনেছি। সে-ই আমাকে আলাদা ফ্ল্যাটে রেখে ব্যবসা করছে। আমি ঘেন্নায় মরে যাচ্ছি। আপনি কি বাঁচাবেন?' আমার নাম—।

ছুটির মনে হল সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলার মধ্যে তার যাওয়ার দরকার নেই। ভাল মানুষ স্বামী নিশ্চয়ই বেশিদিন ভালমানুষ থাকবে না। দ্বিতীয়টিতে স্বামী শীতল বলে যে প্রেমিক খুঁজে নিতে পারে সে নিশ্চয়ই আলাদা হওয়ার রাস্তা পেয়ে যাবে। তার প্রেমিক কি করতে আছে?

বরং তৃতীয় ঘটনাটি তাকে বেশি আকর্ষণ করছে। মনস্থির করে নিল ছুটি। এখন সকাল সাতটাও বাজে নি। দেখা করার জন্যে এর চেয়ে ভাল সময় আর হতে পারে না। মধ্যরাত পর্যন্ত যারা গোপন লালসায় উন্মত্ত থাকে তারা এইসময় অসাড়ে ঘুমায়। জানলাগুলো খুলে দিল সে। প্রথম দুটো গলা এ্যানসারিং মেশিন থেকে মুছে দিল। তারপর চুলে চিরুনি বোলাতে গিয়ে দেখল টিনা চোখ বন্ধ করে দুধ খাচ্ছে। সে হাসল, একেই বলে ঠেলার নাম বাবাজি।

ট্যাক্সি থেকে নেমে ছুটি চারপাশে তাকাল। এটা অফিসপাড়া। বিশাল বিশাল বাড়ি চারপাশে। এখনও অনেক বাড়ির সদরদরজা খোলেনি। নাম্বার মিলিয়ে নির্দিষ্ট বাড়ির সামনে পৌঁছে দেখল সেটি বারোতলা। মেয়েটির নাম খুশী, থাকে এই বাড়ির দশতলায়। নয়তলা পর্যন্ত অফিস, দশ থেকে ডোমেস্টিকাল ফ্ল্যাট, গেস্ট হাউস ইত্যাদি। দরজার পাশে বিরাট বোর্ডে কোন তলায় কি কি আছে লেখা রয়েছে। খুশী বলেছে যে টেন বাই টু নাম্বার ফ্ল্যাটে আছে। তাকে পাহারা দেওয়ার জন্যে এক জাঁহাবাজ মহিলাকে রাখা হয়েছে। এই মেয়েমানুষটি শুধু খুশীর বেডরুমে ঢোকে না।

এখন একটা লিফট চলছে। ছুটিকে বোর্ড দেখতে দেখে একজন দারোয়ান এগিয়ে এল, 'বলিয়ে মেমসাব। আপনি কাকে চান?'

ততক্ষণে ন'তলায় 'ইন্টারন্যাশন্যাল ট্রেডিং এজেন্সি' নামের একটি অফিস আছে দেখে নিয়েছে ছুটি। মিষ্টি করে হাসল সে, 'ইন্টারন্যাশন্যাল ট্রেডিং-এর কেউ এখনও আসেনি?'

'না মেমসাব। ওদের অফিস খোলে ন'টায়। তখন এলে কাজ হবে।'

'তাই? কিন্তু অতক্ষণ আমি কোথায় অপেক্ষা করব! অনেক দূর থেকে এসেছি। আচ্ছা এখানে অপেক্ষা করার কোন জায়গা আছে?' ছুটি করুণ গলায় প্রশ্ন করল।

'আপনি এক কাজ করুন। নয়তলায় চলে যান। ওখানে লিফটের পাশে সোফা আছে ভিজিটার্সদের জন্যে। ওখানে অপেক্ষা করতে পারেন।' দারোয়ান বলল।

মাথা নেড়ে লিফটে উঠল ছুটি। এখন লিফটম্যান নেই। নিজেই বোতাম টিপল। ন'তলায় উঠে লিফট খুলে বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। ছুটি জানে দারোয়ান অবশ্যই লক্ষ্য করবে সে কোন তলায় লিফট থেকে নামছে। সামনেই সোফা রয়েছে। ছুটি সেখানে গিয়ে বসতেই লিফট ওপরে উঠে গেল।

মিনিট খানেক বাদে লিফট নিচে নেমে যেতে উঠে দাঁড়াল ছুটি। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল দশতলায়। অনেকগুলো দরজা। প্রত্যেকের ওপর নাম্বার লেখা। দশের দুই খুঁজে বের করতে অসুবিধে হল না। দরজার পাশে বেলের বোতাম রয়েছে। সেখানে চাপ দিলে নিশ্চয়ই খুশীর পাহারাদারনী দরজা খুলবে। তাকে কি বলা যায়?

ইতস্তত করে শেষপর্যন্ত বোতাম টিপল। দরজা খুলল যে তার শরীর দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থে বেশ মানানসই। চুল মাথার ওপর চূড়ো করে বাঁধা। এপাশ ওপাশ তাকিয়ে মহিলা খিঁচিয়ে উঠল, 'রস, রস বেড়ে গেছে খুব, ধরতে পারলে বাপের নাম ভুলিয়ে দেব।'

দরজা বন্ধ করল মহিলা। তারপর হাঁকল, 'এই যে ভাল মানুষের মেয়ে, আমি বাজারে যাচ্ছি। কেউ বেল বাজালে দরজা খুলবে না।'

'কি করে খুলব? তুমি তো তালা দিয়ে যাবে।' সুন্দর কণ্ঠস্বর ভেসে এল ভেতর থেকে।

'দিতে বাধ্য হই। পাখি যদি পালিয়ে যায় সেই ভয়ে বাবু কাঁপছে, আর পালালে আমার সর্বনাশ করে ছাড়বে। শোন, দরজা খুলতে পারবে না জানি কিন্তু বেল শুনে সাড়া দিও না, যে আসবে সে যেন জানে, ফ্ল্যাটে কেউ নেই।' মহিলা চেঁচিয়ে বলল।

'তোমার এই এককথা রোজ শুনতে ভাল লাগে না।'

'তোমার তো কোন কিছুই ভাল লাগে না। নিত্য নতুন পুরুষ এসে আদর করছে তাও নাকি ভাল লাগে না। পায়ের ওপর পা তুলে আরাম খাচ্ছ,

দরজায় দাঁড়াতে হলে বুঝতে পারতে কত ধানে কত চাল।' মহিলা কথা বলতে বলতে বাজারের ব্যাগ আর চাবি নিয়ে দরজা খুলল। দরজা বন্ধ হল। বাইরে থেকে চাবি দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেল সে।

একটু পরেই মিষ্টি চেহারার একটি মেয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে ডাইনিং টেবিলের দিকে যেতে যেতে চমকে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, 'আপনি? কে আপনি?'

'চিত্রাঙ্গদা।'

'এ্যাঁ? আপনি! কিন্তু কি করে ভেতরে ঢুকলেন?'

'আমি ম্যাজিক জানি। তোমার টেলিফোন পেয়ে দেখা করতে এলাম। তার আগে বলো এই মহিলা সাধারণত কতক্ষণের মধ্যে ফিরে আসে?' ছুটি বলল।

'প্রায় একঘণ্টা।' মেয়েটি যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

'চল, তোমার সঙ্গে কথা বলা যাক।'

'আমার বেডরুমে আসুন। ওখানে মন্থরা ঢোকে না।'

'মন্থরা?'

'আমি ওকে মন্থরামাসী বলে ডাকি।'

'ভালো নাম দিয়েছ।'

খুশীর পেছন পেছন ওর বেডরুমে ঢুকল ছুটি। ওপাশে গ্রীল দেওয়া বড় জানলা। আলো হাওয়া খুব। সে একটা চেয়ারে বসলে খাটে বসল খুশী, 'আমি ভাবতেই পারছি না। কাল টেলিফোনে বলেছি আর আজ আপনাকে এই ঘরে দেখছি।'

ছুটি খুশীকে ভাল করে দেখল। মেয়েটি দেখতে ভাল এবং শরীরের গঠনের জন্যেই আকর্ষণীয়। সে জিজ্ঞাসা করল, 'খুশী, তুমি সামনাসামনি বল, কি চাও?'

'আমি মুক্তি চাই। আমি এই কাজ করতে আর পারছি না।' খুশী মুখ নামালো।

'তোমাকে কেউ যদি জোর করে আটকে রাখে তাহলে তুমি পুলিশে ফোন করতে পার। তুমি এ্যাডাল্ট মেয়ে। পুলিশ তোমাকে উদ্ধার করবেই।' ছুটি বলল।

'না। পুলিশ কিছুই করবে না। ওর সঙ্গে পুলিশের খুব ভাব। একথা উনিই আমাকে বলেছেন।'

'কি বলেছেন?'

'পুলিশ আমাকে জিজ্ঞাসা করবে যে হাত পা বেঁধে রেখেছে কিনা? রাখেনি, রোজ রাত্রে যে কাণ্ড হয় তার কোন প্রমাণও আমার কাছে নেই। তার ওপর ওই মন্থরামাসী সাক্ষী দেবে।'

'পুলিশ দুটো রাত্রে এখানে হানা দিলেই তো তোমার কথার প্রমাণ পাবে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু দেবে না। একজন বড় পুলিশের কর্তাকে উনি মাঝেমাঝেই নিয়ে আসেন।'

'অ।' ছুটি ভাবল একটু, 'এই লোকটার খপ্পরে কি করে পড়লে?'

'ওই তো চাকরির বিজ্ঞাপন দিয়ে আবেদন করেছিলাম। প্রথম দু'মাস আমাকে আধুনিক হওয়ার ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল। তখন উনি ছাড়া কেউ আমার কাছে আসতো না। কেউ বিরক্ত করত না। আমাকে উনি বলেছিলেন বড় কোম্পানীর রিসেপশনিস্ট হওয়ার জন্যে ট্রেনিং দিচ্ছেন। আমিও বিশ্বাস করেছিলাম। ওঁকে দেবতা বলে মনে করেছিলাম।' খুশী থামল।

'তারপর?'

'তারপর একজন ফটোগ্রাফারকে নিয়ে এসে আমার বিভিন্ন পোশাকের ছবি তুলতে লাগলেন। শেষে বিকিনি পরতে বললেন। আমি লজ্জায় কিছুতেই রাজী হচ্ছিলাম না। তখন একটা পত্রিকা দেখালেন। সেখানে বিকিনি পরা মেয়েদের ছবি ছাপা হয়েছে। ওরা নাকি পৃথিবীর নামকরা কোম্পানির রিসেপশনিস্ট। ওঁর ধমক খেয়ে রাজী হতে হয়েছিল। আর তারপরেই আমার নগ্ন শরীরের ছবি তোলাতে বাধ্য করেন।'

'সেসব ছবি তুমি দেখেছ?'

'না। দেখিনি। তবে সন্ধ্যেবেলায় যারা এখানে আসে তারা বলে, ছবিতে দেখে ভেবেছি ফটোগ্রাফির কায়দা, নাঃ, সত্যি, ছবিটা মিথ্যে নয়। তার মানে আমার ছবি এদের আগে দেখানো হয়। বিশ্বাস করুন আর পারছি না।' খুশী কেঁদে ফেলল।

'তোমাকে কত টাকা দেয়?'

'আমাকে একটা পয়সাও দেয় না। তবে যা চাই তা মন্থরামাসী এনে দেয়। ওর ওপর সেইরকম হুকুম দেওয়া আছে। কিন্তু আমার বাড়িতে মাসের এক তারিখে দশ হাজার টাকা নিয়ম করে পাঠায়। ওঁরা ভাবেন আমি পাঠাচ্ছি।'

'ওঁরা যে টাকা পাচ্ছেন তা তুমি জানলে কি করে?'

'দু'মাস অন্তর বাবা আসেন এখানে। আমার খোঁজ নিতে।'

'তখন তাঁকে সব কথা খুলে বলছ না কেন?'

'আমাকে বলা হয়েছে বললে আমি খুন হয়ে যাব। বাবাও আর টাকা পাবে না। ওঁকে আসতে দেওয়া হচ্ছে এক শর্তে যে আমাকে ওঁর সামনে এমন ভান করতে হবে, যাতে বাড়ি ফিরে বলতে পারেন আমি খুব সুখে আছি।'

'দ্যাখো খুশী, এখান থেকে মুক্তি পেলে তোমার বাড়িতে আর টাকা যাবে না। সেই সমস্যাটাকে কিভাবে সামলাবে।'

'না খেয়ে মারা যাব তাও ভালো, কিন্তু এটা আমি সহ্য করতে পারছি না।'

'মারা যাওয়ার কথা বললে বলে জিজ্ঞাসা করছি, আত্মহত্যা করনি কেন?'

'সাহস পাইনি। এখানে তো না খেয়ে মরা যাবে না, জোর করে খাওয়াবে।'

'ঠিক আছে, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি। এই লোকটির নাম কি?'

'পুরো নাম জানি না। সবাই সাহাদা, সাহাবাবু অথবা মিস্টার সাহা বলে ডাকে।'

'কোথায় থাকে?'

'জানি না।'

'রোজ বিকেলে এসে মন্থরামাসীকে নির্দেশ দিয়ে আমার সঙ্গে দুটো কথা বলে চলে যায়।'

'রাত্রে আর আসে না?'

'খুব বাজে ধরনের লোক এখানে থাকলে উনি আর যান না। অন্য ঘরে অপেক্ষা করেন।'

'খুশী, শেষ প্রশ্ন। এখানে আসার আগে তুমি কাউকে ভালবাসতে?'

খুশী দ্রুত মাথা নাড়ল, না।

'কেউ কি তোমাকে ভালবাসতো?'

'জানিনা। কিন্তু—।'

'কি কিন্তু?'

'আপনি আমাকে খারাপ ভাববেন।'

'যদিও তুমি এখন সমাজের চোখে খারাপ কিন্তু সেটা ভাবলে আমি তোমার কাছে আসতাম না। ব্যাপারটা কি?' ছুটি জিজ্ঞাসা করল।

'এক ভদ্রলোক গত দু'মাসে চারবার এসেছেন। বয়স ত্রিশের নিচেই। প্রথমদিনেই আমায় বললেন ছবি দেখে আকর্ষণ বোধ করতে এসেছেন। সারাক্ষণ গল্প করলেন। আমাকে স্পর্শ করলেন না। শুধু যাওয়ার সময় আমার ডান হাতের আঙ্গুলে চুমু খেয়ে বললেন ওখানে যেন কাউকে চুমু খেতে না দিই। তারপর আরও তিনবার এসেছেন। প্রত্যেকবারেই এক ব্যাপার।'

'বুঝলাম। তাঁকে তোমার ভাল লেগেছে?'

'হ্যাঁ। কারণ তিনি এলে মনে হয় আজ বেঁচে গেলাম।'

'তাঁকে আরও ঘনঘন আসতে বলনি কেন?'

'বলেছিলাম। উনি যা রোজগার করেন তাতে মাসে দশ হাজার টাকা এ বাবদ খরচ করাটাই ঠিক নয়। কিন্তু না এসে পারেন না বলে পনের দিনে একবার আসেন।'

'তার মানে মিস্টার সাহা প্রতি রাত্রে পাঁচ হাজার করে নেয়?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এই ভদ্রলোক জানেন তুমি কি জীবন যাপন করছ। হয়তো রূপে মুগ্ধ বলে আসেন, রুচিতে লাগে বলে স্পর্শ করছেন না। একে ভালবাসলে তো তুমি স্বীকৃতি পাবে না।'

'আমি জানি না।'

'কি নাম ভদ্রলোকের?'

'প্রবাল দত্ত।'

'নামটা সত্যি তো!'

'তাও জানি না।'

'ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার চাওনি?'

'ঠিকানা জানিনা, টেলিফোন নাম্বার দিয়েছিলেন।'

ঠিক এই সময় বাইরের দরজায় শব্দ হল। খুশী চমকে উঠল, 'মন্থরামাসী এসে গেছে, কি হবে? আপনাকে দেখে ফেলবে ও!'

'দেখবে না। বলেছি তো, আমি ম্যাজেশিয়ান।' বলতে বলতে পাশের বাথরুমের দরজা খুলে ভেতরে চলে গেল ছুটি। পরক্ষণেই দরজায় এসে দাঁড়াল মন্থরা, 'কার সঙ্গে কথা বলছিলে?'

'নিজের সঙ্গে।' জবাব দিল খুশী।

'মাথা খারাপ নাকি!' ঘুরে দাঁড়াল মন্থরা। দরজা খুলতে খুলতে কানে এল কেউ যেন কথা বলছে। আমি দরজায় তালা দিয়ে গেলাম, ঢুকল কে?'

'ডাক্তার দেখাও।'

'হুম্।' মন্থরামাসী চলে গেল।

খুশী দ্রুত বাথরুমে গেল। দরজা খুলে সে কাউকে দেখতে পেল না। সে হেসে ফেলল। চিত্রাঙ্গদা নিশ্চয়ই ম্যাজিক করেছে। সে হাসিমুখে বাইরে বেরিয়ে দেখল মন্থরামাসী ডাইনিং টেবিলের ওপর বাজার থেকে কেনা জিনিসগুলো বের করে রাখছে। তার দিকে তাকিয়ে মন্থরামাসীর চোখ ছোট হয়ে গেল, 'কি ব্যাপার? আজ হঠাৎ মুখে হাসি দেখছি, রোজ তো প্যাঁচা হয়ে বসে থাকো, আজ কি হল?'

'কি আর হবে? কিছুই হয়নি।' দূরে একটা চেয়ার টেনে বসল খুশী।

কাজ করতে করতে মন্থরা বলল, 'তোমাকে বুঝিয়েও পারিনা, এইযে সাহাবাবু তোমার বাবাকে দশ হাজার করে দিচ্ছে, ক'জন দেয়? এ্যাঁ! মেয়েমানুষের শরীর হল গঙ্গাজলের মত। কখনো অপবিত্র হয় না। স্নান করলেই নতুন।'

'তুমি স্নান করো, নতুন হও।'

'আমার কি সে বয়স আছে! থাকলে এই কাজ করি!'

এই সময় কলিং বেল বেজে উঠতেই বিরক্ত হল মন্থরা। দরজার কাছে গিয়ে কীহোলে চোখ রাখল। তারপর দরজা ঈষৎ ফাঁক করে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে?'

'আপনাদের ফ্ল্যাটে কোন অল্পবয়সী মহিলা এসেছে?'

'না তো!'

'একজন এসে বলল ইন্টারন্যাশন্যাল ট্রেডিং অফিসে যাবে আর অন্য দারোয়ান তাকে ন'তলায় গিয়ে অপেক্ষা করতে বলেছে অফিস খোলার জন্যে অপেক্ষা করতে। আমি তখন ছিলাম না। শুনে নয়তলায় গিয়ে দেখি সেখানে কেউ নেই। মহিলা কোথায় গেল তাই খুঁজছি। ঠিক আছে।'

'অন্য দারোয়ানের চাকরি যাওয়া উচিত।'

'ও নতুন, সব আইন জানে না। আচ্ছা—।' লোকটি চলে গেল।

'যত ঝুটঝামেলা।' দরজা বন্ধ করে ডাইনিং টেবিলের কাছে চলে গেল মন্থরা। তারপর হাসল, 'আজ ভেটকির ফিলেট এনেছি।'

'কেন? খুশী জিজ্ঞাসা করল।

'ফ্রাই করে দিতে হবে। সাহাবাবুর অর্ডার। মনে হচ্ছে বড় কেউ আসবে।'

'আসার আগে মরে যাক।'

'তোমার মনে কৃতজ্ঞতা বলে কিছু নেই। একি!' চিৎকার করে উঠল মন্থরা।

খুশী অবাক হয়ে তাকাল।

তখন চারপাশে তন্নতন্ন করে খুঁজছে মন্থরা। বেশ দিশেহারা দেখাচ্ছে তাকে।

'কি হয়েছে?' খুশী জিজ্ঞাসা করল।

'ভেটকির ফিলেটের প্যাকেটটা কোথায় গেল?'

'বাজারে ফেলে এসেছ।'

'না। আমি এনেছি। এখানে রেখেছিলাম।'

'রাখলে কোথায় যাবে?'

সোজা হল মন্থরা, 'তুমি এদিকে এসেছিলে?'

'আশ্চর্য! আমি তো তখন থেকে এখানেই বসে আছি।'

'তাইতো। অতবড় প্যাকেট, এক কেজি ফিলেট, কোথায় গেল!' মুখ শুকনো মন্থরার।

'রান্নাঘরে রেখে আসোনি তো?' খুশির খুব ভাল লাগছিল।

'রান্নাঘরে?' একটু চিন্তা করল মন্থরা, 'না রান্নাঘরে আমি তো ঢুকিনি।'

'তাহলে তুমি বাজারে ফেলে এসেছ।'

'কিন্তু—!' মাথায় হাত দিয়ে বসল মন্থরা।

এইসময় টেলিফোন বাজল। খুশী উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে নিষেধ করল মন্থরা, 'না। তুমি টেলিফোন ধরবে না।' দ্রুত চলে এল সে, 'হ্যালো!'

ওপাশ থেকে যা তাকে বলা হল তা মন দিয়ে শুনল সে। তারপর মিউ মিউ করে বলল 'আমি বাজার থেকে ভেটকির ফিলেট কিনে এনেছিলাম এক কিলো। এখন ব্যাগটা পাচ্ছি না। এ্যাঁ। না, না, খুশী এদিকে আসেনি। কি করব বলুন! না, মাইরি বলছি, কিনে এনে টেবিলের ওপর রেখেছিলাম। আমার কাছে আর অত টাকা নেই যে আবার গিয়ে কিনব? কিন্তু এরকম তো এর আগে কখনও হয়নি। আচ্ছা কথা, আমি নেশা করব কেন? ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

টেলিফোন রেখে মন্থরা হাসল, 'লোকটা ভাল। খুব গালাগালি করার পরে বলল রেস্টুরেন্ট থেকে কিনে নিয়ে আসবে। যাক, বাঁচা গেল।'

নিশ্চিন্ত হয়ে আবার ডাইনিং টেবিলে গিয়ে বাকি বাজারটা ঝুড়িতে তুলে রাখল মন্থরা। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'খিদে পেয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'তাতো পাবেই। চিকেন প্যাটিস আছে। দিচ্ছি।'

'কিনে এনেছ?'

'হ্যাঁ। একি বাক্সটা কোথায় গেল? উঃ, পাগল হয়ে যাব।' আবার বাক্স খুঁজতে লাগল মন্থরা। খুশী তাকিয়ে দেখল বাক্সটা নিচে পড়ে আছে। সে বলল, 'ওই তো ওখানে।'

'ওখানে গেল কি করে? এখান থেকে ওখানে যাওয়ার কথা নয়।' বাক্সটা তুলে প্লেটে প্যাটিস সাজিয়ে খুশীকে দিল মন্থরা।

'তুমি খাবে না?'

'স্নান করে খাবো। বাজার থেকে এসেছি না?'

প্যাটিস নিয়ে শোওয়ার ঘরে চলে গেল খুশী। আর তারপরেই মন্থরার চিৎকার শোনা গেল, 'এবাড়িতে ভূত ঢুকেছে, নিশ্চয়ই ভূত। ও বাবা গো, কি হবে?'

খুশী বেরিয়ে এল, '—চেঁচাচ্ছ কেন?'

'চেঁচাবো না? তোমায় একটা প্যাটিস দিলাম আর অন্যটা বাক্সে ছিল, এখন দেখছি এই সস্‌প্যানের জলের মধ্যে ওটা পড়ে আছে।'

'তোমার মাথার ঠিক নেই, ওটা তুমি ভুল করে রেখেছ।'

'সত্যিই আমার মাথার ঠিক নেই?'

'হ্যাঁ। এখন তুমি ভূত ভূত করছ। তাছাড়া ভূত কি দশতলায় উঠতে পারে?'

'দশতলায় পারেনা?'

'না। আশ স্যাওড়া গাছে ভূত থাকে। সেটা বড়জোর দোতলার সমান লম্বা।'

'ও। কিন্তু—।'

'যাও, স্নান করে নাও।'

হতবুদ্ধি মন্থরা পাশের বাথরুমে ঢুকে গেল। জলের শব্দ হল। আর তারপরেই মন্থরা হাউমাউ করে উঠল। বাথরুমের দরজা খুলে গেল। প্রায় বিবস্ত্রা মন্থরা লাফাচ্ছে, 'মরে গেলাম। মরে গেলাম। ওরে বাবারে। আমার কি হবে!'

'কি হয়েছে?' খুশী হাসি চাপতে পারল না।

'এই হতচ্ছাড়া সাবানটা আজ কিনে এনেছি। এটা গায়ে মুখে মাখতেই জ্বলে যাচ্ছে। ওরে বাবারে। জল, জল।' বলতে বলতে শাওয়ার খুলে দিল সে। সরে এল খুশী। শোওয়ার ঘরে ঢুকে চোখ বড় হয়ে গেল খুশীর। একগাল হেসে বলল, 'খুব জব্দ করেছ ওকে।'

ওর কথা বলার ভঙ্গিতে ছুটির মনে হল মেয়েটা সত্যি সরল, সহজ।

ছুটি বলল, 'আস্তে কথা বল।'

'এখন স্নান করছে। শুনতে পাবে না। কি করে ওর সাবানে জ্বলুনি এনে দিলে?'

'এসব গোপন ব্যাপার, বলতে নেই। বললেই ম্যাজিক নষ্ট হয়ে যায়।' ছুটি কথা শেষ করতেই মন্থরার গলা শোনা গেল, 'ওরে বাবা, এখনও জ্বলুনি থামছে না, গায়ে কাপড় রাখতে পারছি না।'

ছুটি চাপা স্বরে বলল, 'সাহাবাবুকে ফোন করতে বল, যাও।'

খুশী বেরিয়ে এল। মন্থরা তখন ফ্যানের নিচে দাঁড়িয়ে। শরীরের অনেকটাই খোলা। চোখ বন্ধ।

খুশী জিজ্ঞাসা করল, 'কি করে হল?'

'জানি না, জানি না। জ্বলছে, খুব জ্বলছে।'

'তোমার বাবুকে ফোন করো।'

'এ্যাঁ!' অবাক হয়ে তাকাল মন্থরা।

'তাকে ডেকে দেখাও তোমার শরীরে কি হয়েছে!' খুশী হাসল।

'একসময় লোকটা এই শরীরই দেখত, তুমি তো দুদিনের যোগী।' বলতে বলতে ফোনের কাছে গিয়ে রিসিভার তুলল মন্থরা। ডায়াল করল, 'হ্যালো, আপনি এখনই ফ্ল্যাটে চলে আসুন। এখানে সব অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে। মাছের ফিলেট হারিয়ে গেল, প্যাটিসের প্যাকেট টেবিলে রেখেছিলাম, পাওয়া গেল জলে, তারপর স্নান করতে গিয়ে সাবান মাখতেই সারা শরীর লালচে হয়ে জ্বলছে। আপনি আসুন।'

'ব্যাস, তোমার সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।' খুশী হাত নাড়ল।

'মনে হচ্ছে খুব মজা পাচ্ছ!' মন্থরা উগ্রমূর্তিতে তাকাল।

'তা একটু পাচ্ছি।'

'দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি। আসুক সাহাবাবু।' মন্থরা ঘরের উল্টোদিকে ডাইনিং টেবিলের দিকে গেল, 'ওমা, প্যাটিসের প্যাকেটটা কোথায়? স্নান করে এসে খাবো বলে ভেবেছিলাম!'

'এই বললে দুটো এনেছ। একটা আমি খেয়েছি আর একটা জলে নষ্ট হয়েছে।'

'না। তিনটে ছিল। তৃতীয়টা প্যাকেটেই রেখেছিলাম।' চারপাশে তাকিয়ে শেষপর্যন্ত খুঁজে পেল মন্থরা।' কি করে এতদূরে চলে গেল কে জানে! ভৌতিক ব্যাপার! এখন চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থেকো নাতো, এটা খেতে দাও।'

'খাও না, তোমাকে খেতে দেখতে বেশ ভাল লাগে।'

'মরণ!' প্যাটিসে কামড় দিয়ে চেয়ার টেনে মন্থরা খুশীর দিকে তাকিয়ে খেতে গেল। খুশী দেখল চেয়ারটা ঝটপট সরে গেল এবং মন্থরা সশব্দে মাটিতে আছাড় খেল, হাত থেকে বাকি প্যাটিস ছিটকে বেরিয়ে গেল।

মন্থরা চেঁচাচ্ছে, 'ওরে বাবারে, মরে গেছি রে। আমার হাড় ভেঙে গেছে রে।' মেঝে থেকে উঠতে পারছিল না সে। খুশী জিজ্ঞাসা করল, 'কি করে পড়লে?'

'ভূতে টেনে ফেলে দিল। চেয়ারটাকে আমি টেনে এনে দেখে বসেছি অথচ ঠিক সময়ে চেয়ারটা পেছনে নেই? এ হতে পারে?' মন্থরা ওঠার চেষ্টা করছিল।

'হলো তো!' খুশী বলল, 'যাই, একটু ঘুমোই।'

'ঘুমোবেই তো। আমি মরছি জ্বালায় আর তুমি ঘুমোবে না?'

'তোমার সাহাবাবু বলেছেন ঘুমিয়ে মুখ ফুলিয়ে রাখতে, বলেনি?'

'সেতো রোজ বলে, আজই তোমার শোয়ার ইচ্ছে হল?' উঠে দাঁড়াল মন্থরা, 'ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে। তোমারও এই অবস্থা হবে।'

'কক্ষণো নয়, যারা মানুষকে যন্ত্রণা দেয়, ভগবান তাদের এই শাস্তি দেন।' খুশী চিৎকার করে কথাগুলো বলল। ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে মন্থরা। খোঁড়াতে খোঁড়াতে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বলল, 'সব বলব সাহাবাবুকে। আসুন তিনি। সব বলব। কী নেমকহারাম মেয়েমানুষরে বাবা।'

ঘরে ফিরে এসে খুশী দেখল ছুটি বসে আছে চেয়ারে। বলল, 'বেশ করেছ। একেবারে হাড় ভেঙে দিলে না কেন? দিলে খুশী হতাম।'

'ওর হাড় ভাঙলে তোমার কি উপকার হবে। আর একজন আসবে পাহারাদারি করতে। শোন, জল যা খাওয়ার তা এখনই খেয়ে নিয়ে এক বোতল জল এই ঘরের কোথাও রেখে দাও। ফ্রিজে যেসব জলের বোতল তোলা আছে তা একদম ছোঁবে না।'

'কেন?'

'যা বললাম তাই করো।'

খুশী আর দাঁড়াল না। টেবিলে রাখা জলের বোতলদুটো তুলে নিয়ে এল ঘরে। এসে এক কোণে লুকিয়ে রাখতে না রাখতেই বেল বাজল।

ছুটি চাপা গলায় বলল, 'যাও, সাহাবাবু বোধহয় এসে গেছেন।'

ঘরের বাইরে পা দিয়ে খুশী দেখল মন্থরা খোঁড়াতে খোঁড়াতে দরজা খুলতে যাচ্ছে। সাহাবাবু ফ্ল্যাটে ঢুকেই প্রশ্ন করলেন, 'কি ব্যাপার? মোবাইল-এ ফোন করেছ কেন?'

'আমি এখানে থাকতে পারছি না! ভূত আছে।' ককিয়ে উঠল মন্থরা।

'চোপ, এতদিন কিছু হয়নি এখন ভূত এসে গেল? নেশা করছ নাকি?'

'মাইরি না।'

চট করে খুশীকে দেখে নিলেন সাহাবাবু। তারপর চেয়ার টেনে বসে বললেন, 'ঠিক আছে, সব শুনছি। এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াও তো।'

'চা করব?' মন্থরা জিজ্ঞাসা করল।

'না। জল চেয়েছি, জল দেবে। আজকাল বড্ড বেশী কথা বল।' সাহাবাবু বিরক্ত।

'ঠাণ্ডা না প্লেইন?' জিজ্ঞাসা না করে পারল না মন্থরা।

'ঠাণ্ডা। বড্ড গরম। হ্যাঁ খুশী, ভুত তোমার কি করেছে?'

'কিছু না তো। আমি ভূত-টুত দেখিনি।'

'তবে! ভূত বলে কিছু নেই, সব মানুষের মনের ভূত।' সাহাবাবু হাত বাড়িয়ে জলের গ্লাস নিলেন। মন্থরা বলল, 'তাহলে ভেটকি মাছের ফিলেট কোথায় গেল?'

'কোথায় আবার যাবে! হয় বাজারে ফেলে এসেছ, নয় কেনোইনি।'

'কি? আমি মিথ্যে বলেছি? আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন?'

'চিৎকার করো না। কোন কিছু না করেও অনেক সময় মনে হয় করেছি।' জলে মুখ রেখে পুরোটা খেয়ে ফেললেন সাহাবাবু।

'ও, তার মানে আমাকে বাহাত্তুরে ধরেছে?'

'আহা তা ধরবে কেন? ভুল তো মানুষ মাত্রেই হয়।'

'প্যাটিস জলে পড়ল কি করে? চেয়ার পেছন থেকে সরিয়ে নিল কে?'

হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন সাহাবাবু। তারপর কোন কথা না বলে ছুটে গেলেন টয়লেটের দিকে। দড়াম করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

খুশী জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল?'

'হবেই তো। বিনা দোষে দোষী করল আমাকে। এই বয়সে উল্টোপাল্টা খেলে বাথরুমে যেতে হবে না? ঠিক হয়েছে!' মন্থরা মাথা নাড়ল।

'আমাকে এক গ্লাস জল দাও তো!' খুশী বলল।

'টেবিলের ওপর বোতল আছে, খাও না।'

'না আমি ঠাণ্ডা জল খাবো।'

'ঠাণ্ডা জল খাওয়া তোমার বারণ। গলা ধরে জ্বর এলে রাত্তিরবেলায় কেলো হবে।' জলের কথায় মন্থরার মনে হল তার গলা শুকিয়ে গেছে। সে ফ্রিজ থেকে বের করা জল খেতে যাচ্ছিল, এমন সময় সাহাবাবু বেরিয়ে এলেন, 'উঃ। কী ভয়ঙ্কর। পেট মোচড় দিয়ে যন্ত্রণা—।'

'কি খেয়েছিলেন?' মন্থরা জিজ্ঞাসা করল।

'চা-বিস্কুট। তোমার ওই জল খেয়ে এরকম হল।'

'ফোটানো জল, ফ্রিজে ছিল, তাই খেয়ে আপনার হল? যা ব্বাবা।' বোতলটা ওপরে তুলে ঢক ঢক করে কিছুটা ঠাণ্ডা জল খেয়ে নিল মন্থরা, 'কই, কোন গন্ধই নেই।'

সাহাবাবু চেয়ারে বসলেন, 'শোন খুশী। তোমার সম্পর্কে কেউ কেউ বলছে তুমি খুব ঠাণ্ডা। এরকম বদনাম এই লাইনে রটলে আর করে খেতে হবে না। তোমার বাবা যে দশ হাজার করে পাচ্ছেন তাও বন্ধ হয়ে যাবে। বদনাম যাতে না রটে তার চেষ্টা করো।'

মন্থরা বলল, 'অন্যদিন তো সাতচড়ে রা কাড়তো না আজ কথার খই ফুটছে।'

'ভালো, খই ফোটা ভাল।' সাহাবাবু বললেন, 'ওকে একটু খারাপ কথা শিখিয়ে দিও তো। লোকে শুনতে ভালোবাসে।'

হঠাৎ মন্থরাকে দেখা গেল চোঁ চোঁ করে বাথরুমের দিকে দৌড়াতে। দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হল। সাহাবাবু হেসে উঠলেন, 'বললাম না, ওই জলেই কিছু—।' কথা শেষ করতে পারলেন না তিনি। সোজা হয়ে বসলেন। খামচে ধরলেন পেট, 'এই বাথরুম বন্ধ। তোমারটায় যাই।' খুশীর বেডরুমের বাথরুমে দৌড়ে গেলেন তিনি।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দুটো মানুষ অন্তত চৌদ্দবার বাথরুমে ছুটল। শেষে দুজনে আর বাথরুম থেকে বেরুতে পারছিল না। দু'জনেই কমোটের ওপর বসে হাঁপাচ্ছে।

খুশী বাইরে থেকে জিজ্ঞাসা করল, 'ডাক্তার ডাকব?'

সাহাবাবু চিঁচি করে বললেন, 'হ্যাঁ।'

'আমি তো নাম্বার জানি না।'

'দারোয়ানকে ডেকে বল। আমি আর বাঁচবো না।'

'দারোয়ানকে ডাকতে হলে দরজা খুলে বেরুতে হয়।' খুশী বলল।

'মন্থরা কি করছে?' সাহাবাবু চিঁচি করলেন।

'ওই বাথরুমের মেঝেতে শুয়ে আছে।'

'তাহলে তুমিই যাও খুশী! আমাকে বাঁচাও।'

'আপনার বাড়িতে খবর দিতে হবে?'

'না-না। বাড়ির লোক এই বিজনেসের খবর জানে না।'

খুশীর পাশে এসে দাঁড়াল ছুটি। ফিসফিস করে যা বলল তাই আওড়ালো খুশী, 'আপনার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলেও খবর দেব না?'

'না।'

ছুটি এগিয়ে গিয়ে সাহাবাবুর ছেড়ে রাখা জামাপ্যান্ট তুলে মোবাইলটা খুঁজে বের করল। তারপর বোতাম টিপে টিপে ফোনবুক বের করে হোমের টেলিফোন নাম্বার দেখে খুশীকে বলল, 'এছাড়া কোন পথ নেই।'

ছুটি নাম্বার ডায়াল করল। একজন মহিলার গলা পেতে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি মিসেস সাহা?'

'হ্যাঁ। আপনি কে বলছেন?'

'আমাকে আপনার স্বামী রোজ রাত্রে ব্যবহার করে টাকা রোজগার করেন।'

'কি? মিথ্যে কথা! কে আপনি?'

'আমি কে জানতে চাইলে চলে আসুন এখানে। আপনার স্বামীর ভাড়া করা ফ্ল্যাটে আমাকে প্রায় বন্দী করে রাখা হয়েছিল। ঠিকানাটা লিখে নিন। হ্যাঁ, আসার সময় আপনার স্বামীর চেকবই নিয়ে আসবেন মনে করে।' বাড়ির ঠিকানা বলে ফোন ছেড়ে দিল ছুটি।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সাহাবাবুর মোবাইল বেজে উঠল। ওটা তুলে ছুটি দেখল সাহাবাবুর বাড়ির নাম্বার ফুটে উঠেছে। সে বোতাম টিপে অন করে বলল, 'আপনাকে তো চলে আসতে বললাম। ওঁর পক্ষে এখন কথা বলা সম্ভব নয়।' মোবাইলটা অফ্ করে দিল ছুটি।

চোখ বড় করে সংলাপ শুনছিল খুশী। তার দিকে তাকিয়ে ছুটি জিজ্ঞাসা করল, 'এখন বল, তুমি কি চাও? তুমি যে আমার কাছে সাহায্য চেয়েছ তা এখনও ওরা কেউ জানে না। তাই ইচ্ছে হলে তুমি এখানে আগের মত থাকতে পার।'

'না-না। আমি এখানে থাকলে মরে যাব।' কেঁদে ফেলল খুশী।

'কিন্তু তুমি কোথায় যাবে? কোথায় গিয়ে থাকবে?'

'কেন? আমাদের বাড়িতে।'

'ঠিক আছে। কিন্তু তুমি বাড়িতে ফিরে গেলে তোমাদের বাড়ির রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে। ওই দশ হাজার টাকা বন্ধ হওয়া মানে বুঝতে পারছ? তুমি বাড়িতে বসে থাকলে ওরা সহ্য করতে পারবে না। তাছাড়া এই সাহাবাবুরা তোমার বাবা, মা, পাড়ার লোকের কাছে খবর পৌঁছে দেবেন তুমি কিভাবে এখানে ছিলে। তোমার ওইসব ছবি ওদের কাছে আছে, ভুলে যেও না।'

খুশী ছুটির কথা মন দিয়ে শুনছিল। এবার বলল, 'তাহলে আমার কি হবে?'

'একটাই পথ আছে। জানিনা তিনি রাজী হবেন কিনা। তুমি প্রবাল দত্তকে ফোন কর।'

'প্রবাল!' অবাক হয়ে গেল খুশী।

'হ্যাঁ। যে মানুষটা অত টাকা খরচ করেও তোমাকে স্পর্শ করেননি, যে টাকা খরচ করার জন্যে তাকে নিশ্চয়ই অসুবিধায় পড়তে হয়েছে, সেই মানুষটা হয়তো তোমাকে ভালবেসেছেন।'

'ফোন করে কি বলব?'

'সোজাসুজি জিজ্ঞাসা কর তিনি তোমাকে ভালবাসেন কিনা। যদি হ্যাঁ বলেন তাহলে এখনই এখানে চলে আসতে বলবে।' ছুটি হুকুম করল।

খুশী দৌড়ে শোওয়ার ঘরে গেল। একটু বাদেই সে ফিরে এল ভাঁজ করা কাগজ হাতে নিয়ে। টেলিফোন তুলে ডায়াল করল। করে বলল, 'এনগেজড্।'

'আবার করো।' ছুটি শোওয়ার ঘরে ঢুকল। নেতিয়ে পড়েছেন সাহাবাবু। বাথরুমের মেঝের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। আপাতত ওর কাছ থেকে বাধা পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

রিং হচ্ছে। খুশী যেন পায়ে জোর পাচ্ছিল না। তারপর হেলো শব্দটা শুনল।

'হ্যালো, প্রবালবাবু আছেন? আমি? আমি খুশী। হ্যাঁ। না। শুনুন, আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করব?' ঢোঁক গিললো খুশী। 'আপনি, আপনি কি আমাকে ভালোবাসেন? চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল খুশী। এক দুই তিন চার। তারপর গলা শুনল। শোনামাত্র তার মুখ আশ্বিনের সকাল হয়ে গেল। সে ঝটপট বলল, 'তাহলে এখনই আমার এখানে চলে আসুন। প্লিজ।' রিসিভার নামিয়ে রেখে হাসিমুখের চিবুক বুকের ওপর ঠেকালো খুশী।

ছুটি লক্ষ্য করছিল। জিজ্ঞাসা করল, 'আসছেন?'

নীরবে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল খুশী।

'বাঃ। ভাল। শোন খুশী। মিসেস সাহা এলে প্রথমে সব কথা বলবে। তারপর ওদের চিকিৎসার ব্যবস্থা তিনি করবেন। আমি ভেবেছিলাম তোমার জন্যে বেশ কিছু টাকা ওঁর কাছ থেকে আদায় করে নেব। এখন আর তার দরকার নেই।'

'আপনাকে আমি কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাবো—।' গলা ধরে এল খুশীর।

'তোমার জীবন সুখের হলেই আমি খুশী হব। গতকাল পর্যন্ত যে অতীতটা তোমার ছিল তা একেবারে মন থেকে মুছে ফেলতে চেষ্টা কর। আচ্ছা, আমি চলি।' ছুটি বলল।

'আপনি চলে যাবেন? ওরা যে আসছে।'

'আমি বিশ্বাস করি এখন তুমি নিজেই পরিস্থিতি সামলে নিতে পারবে। আর হ্যাঁ, আমার কথা, ম্যাজিকের কথা কাউকে বলার দরকার নেই। এলাম।' দরজা খুলে বেরিয়ে এল ছুটি। লিফট চালু হয়ে গেছে অফিসের জন্যে। লিফটম্যান রয়েছে এখন।

লিফট নিচে নেমে এলে গেট খুলে দিল লিফটম্যান। গম্ভীর মুখে বেরিয়ে এল ছুটি। দারোয়ানদের চোখের সামনে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসার পর একটা খালি ট্যাক্সি ডেকে তাতে উঠে পড়ে চালাতে বলল ড্রাইভারকে। ঠিক তখনই দারোয়ানদের খেয়াল হল। ওরা হৈচৈ শুরু করতেই ট্যাক্সি চলে এল অনেক দূরে।

এখন ভর দুপুর। ফ্ল্যাটে ফিরে এসে টিনাকে কৌটোর খাবার খেতে দিল ছুটি। প্রবাল দত্তের জন্যে ওর মন খুব নরম হয়েছিল। এখনও এরকম পুরুষ দেখা যায়? তার মনে হত যেকোন পুরুষ মাত্রই নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু বোঝে না। বড় কিছুর আশা পেলে চুক্তিভঙ্গ করতে তাদের বিবেকে লাগে না। প্রবাল ব্যতিক্রম হল কি করে?

এ্যানসারিং মেশিনটা চালু করল ছুটি। এবং তখনই গলাটা শুনতে পেল, 'আমি একজন গৃহবধূ। আমাকে রোজ সন্ধ্যের আগে এক মহিলা টেলিফোনে বিরক্ত করছেন। তাঁকে আমি চিনিনা। তিনি আমার স্বামীকে নিয়ে এমন খারাপ কথা বলছেন যে আমার জীবন বিষ হয়ে উঠেছে। প্লিজ উদ্ধার করুন। আমার নাম সুবর্ণা, টেলিফোন নাম্বার—।'

মেশিনটাকে বন্ধ করে দিল ছুটি। তারপরেই খেয়াল হল এ কোন নাম্বার? এতো—এতো! আবার মেশিন চালু করে সুবর্ণার বক্তব্য শুনল সে। তারপর হো হো করে হাসতে লাগল। বেচারা! মেয়েটা জানে না কার কাছে অভিযোগ করেছে! কিন্তু সুবর্ণার এই অভিযোগ জানানোর ব্যাপারটা কি তুহিন জানে? না, নিশ্চয়ই জানেনা। জানলে এই টেলিফোন নাম্বারটাকে ও চিনতো। চিনলে কখনই বউকে ফোন করতে দিত না। ঘড়ি দেখল ছুটি। এখনও ছ'টা বাজতে ঘণ্টা চারেক আছে। অভিযোগ যখন এসেছে তখন তার প্রতিকার করতে সে দায়বদ্ধ। দেখাই যাক না!

বেল বাজাতে হল দু'বার। সরু চেনে বাঁধা দরজার পাল্লাদুটো ঈষৎ ফাঁক হল, 'কে?'

গলাটা যে সুবর্ণার তা বুঝতে অসুবিধে হল না। এরকম ভয়ার্ত প্রশ্ন সে টেলিফোনে অনেকবার শুনেছে। ছুটি খুব নরম গলায় বলল, 'আমি চিত্রাঙ্গদা। আমাকে কেউ ফোন করেছিল।'

'চিত্রাঙ্গদা?' যেন নামটা প্রথম শুনেছে এমন গলায় বলল সুবর্ণা। তারপর তড়িঘড়ি দরজা খুলল, 'আসুন, আসুন। আমি ভাবতেই পারিনি আপনি আসতে পারেন!'

সামনে দাঁড়ানো সুন্দরী মহিলার দিকে তাকাল ছুটি। ওর বুকের ভেতরটা প্রথমে কেঁপে উঠলো। তারপর জ্বলুনি ধরল। এই সুন্দরীর জন্যে তুহিন তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এই মেয়ে তার থেকে কতটা সুন্দরী? হ্যাঁ,

বয়স হয়তো একটু কম, একটু বেশী ফর্সা, কিন্তু লম্বায় তো সমান সমান। তাহলে? সুবর্ণা হাসল, 'আসুন, ভেতরে আসুন।'

ছুটি ঢুকল। সুন্দর বসার ঘর। সুবর্ণা তাকে সোফায় বসিয়ে বলল, 'কি আনব বলুন! চা না সরবত?'

'ধন্যবাদ। আমি ওসব খাই না। আপনি বসুন।' ছুটি হাসল।

সুবর্ণা বলল, 'আমি ভাবতেই পারছি না—!'

'টেলিফোনে শুনেছি, তবু আর একবার আপনার সমস্যাটা বলুন।' ছুটি বলল।

'হ্যাঁ। হঠাৎ কিছুদিন থেকে এক মহিলা আমাকে ফোন করে বিরক্ত করছেন। সাধারণত বিকেলবেলায় তার ফোন আসে। ব্যঙ্গ করে কথা বলেন। আমি আমার স্বামী বাড়িতে ফিরলে তাকে নিশ্চয়ই জড়িয়ে ধরব, কিন্তু ধরার সময় যেন দেখি ওর গলায় অন্য মেয়ের লিপস্টিকের দাগ আছে কিনা।'

'অন্য মেয়ের লিপস্টিক আপনার স্বামীর গালে কি করে যাবে?' ছুটি জিজ্ঞাসা করল।

'মিথ্যে কথা। মিছিমিছি ওইসব কথা বলে আমাকে ভয় পাওয়াচ্ছে।' প্রতিবাদ করল সুবর্ণা।

'আপনি কোন দাগ দেখতে পাননি?'

'না। তারপর বলল, রুমালে মুছেছে, রুমাল চেক করলাম, সেখানেও নেই। তারপর বলল, পুরোন রুমালে মুছে ফেলে দিয়ে নতুন রুমাল কিনেছে। কি বলব বলুন।'

'আপনার বিশ্বাস উনি অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে ইনভলভড নন।'

'অসম্ভব।' জোর দিয়ে বলল সুবর্ণা।

'আপনার আগে?'

এবার মাথা নামালো সুবর্ণা, 'হ্যাঁ আগে ছিল।'

'সেই ভদ্রমহিলা কোথায়?'

'তিনি খুব বড়লোক ছেলেকে বিয়ে করে চলে গেছেন।'

'কি?' নিজের অজান্তেই চিৎকার করে উঠল ছুটি।

অবাক হয়ে তাকাল সুবর্ণা, 'হ্যাঁ। কোন কোন মেয়ে স্বার্থ ছাড়া কিছু বোঝে না। প্রেম ভালোবাসা তাদের কাছে মূল্যহীন। আমার স্বামীর সঙ্গে যার সম্পর্ক ছিল সে-ও তেমন।'

'একথা আপনাকে কে বলেছে?'

'আমার স্বামী।'

'তিনি যে সত্যি বলেছেন তার কোন প্রমাণ আছে?'

'মানে?'

'তিনি তো বানিয়ে একটা গল্প বলতে পারেন।'

'না। উনি কেন মিথ্যে বলবেন!'

'বেশ, আমার মনে হচ্ছে আপনাকে যে মহিলা বিরক্ত করেন তিনি আর আপনার স্বামীর প্রাক্তন প্রেমিকা একই মানুষ।'

'কি করে হবে? তিনি এখন বড়লোকের বউ। তার কি দরকার পড়েছে এরকম কাজ করার।' সুবর্ণা মাথা নাড়ল।

'আপনার বিয়ে হয়েছে কতদিন?'

'পাঁচমাস।'

'এই পাঁচমাস ধরেই ফোনটা আসছে?'

'না। কয়েকদিন হল ফোন করছে মহিলা।'

'আপনার স্বামী জানেন?'

'হ্যাঁ। ও ব্যাপারটাকে পাত্তা দিতে নিষেধ করেছে।'

'হুঁ।'

'আর অদ্ভুত ব্যাপার, আমার স্বামী ঘরে থাকলে বেশীর ভাগ সময় ফোন আসে না। ওঁর আসার সময় হলে বলে, এখনই তো তোমার বর আসছে, অথবা এসে ঘর থেকে যেই বেরিয়ে যায় অমনি ফোন বাজে। যেন পাশের ঘর থেকে কেউ লক্ষ্য করছে এঘরে কি হচ্ছে। কি করে ওই মহিলা টের পায় তা বুঝতে পারি না।'

'বেশ। আমি না হয় কিছুক্ষণ থাকব। দেখি ফোন আসে কিনা।'

'ইস্!' সুবর্ণার মুখে আফশোস।

'কি হল?'

'আমাকে চারটের সময় বেরুতে হবে যে!' সুবর্ণা বলল।

'ডাক্তারের কাছে যাব। উনি অপেক্ষা করবেন।'

'কারও শরীর খারাপ?'

'হ্যাঁ। মানে, তা ঠিক নয়—!'

'বুঝলাম না।'

লজ্জা লজ্জা ভাব ফুটে উঠল সুবর্ণার মুখে, 'দুমাস আগে বোঝা গিয়েছে। আজ চেক আপ করতে যেতে বলেছেন ডাক্তার।' মুখ নামাল সে।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মনে গরম হলকা লাগল। ছুটি দাঁতে দাঁত চাপল। ও। বিয়ের পর আর তর সয়নি? সঙ্গে সঙ্গে বাবা হতে চেয়েছে তুহিন? মনে হচ্ছিল সব গুঁড়িয়ে শেষ করে দিলেও তৃপ্তি হবে না। সে উঠে দাঁড়াল।

'আপনি চলে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি বিজ্ঞাপনে যা লিখেছেন তা হবে?'

'আমি তো সব শুনলাম, চেষ্টা করব। আচ্ছা—।'

ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এল ছুটি।

ফ্ল্যাটে ঢুকে দরজা বন্ধ করে চেয়ারে বসে সশব্দে কেঁদে উঠল সে।

বেশ কিছুক্ষণ কাঁদার পর হঠাৎ ওর মনে মায়া এল। সুবর্ণা মেয়েটা তো কোন দোষ করেনি। দোষ করেনি ওর পেটে যে বাচ্চা একটু একটু করে বড় হচ্ছে। তুহিনের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিলে সবচেয়ে আগে শাস্তি পাবে তো ওরাই। যে বাচ্চা পৃথিবীতে আসছে তাকে শাস্তি দেওয়ার কোন অধিকার তার নেই।

সে উঠল। এ্যানসারিং মেশিনের সব গলা মুছে দিয়ে ওটাকে অফ্ করে দিল। তারপর কাগজ কলম নিয়ে বসল। কিছুটা সময় নিয়ে লেখাটাকে শেষ করে সে ঘড়ির দিকে তাকাল। চারটে বাজতে কয়েকমিনিট বাকি আছে। সে ফোনের বোতাম টিপল।

'হ্যালো সুবর্ণা। না, ভয় পেও না। একটু আগে আমি তোমার কাছে গিয়েছিলাম।'

'উঃ। সত্যি আমি ভয় পেয়েছিলাম।'

'তুমি তো এখন ডাক্তারের কাছে যাচ্ছ!'

'হ্যাঁ।'

'তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। ডাক্তারের কাছ থেকে বেরিয়ে তোমার স্বামীকে নিয়ে সোজা আমার কাছে চলে আসবে। তিনি ঠিকানা শুনে

কিছুতেই আসতে রাজী হবেন না। কিন্তু তুমি শুনবে না। জোর করে তাকে নিয়ে আসবে। আর আসার পর জানবে তোমাকে কেউ কখনও বিরক্ত করবে না। ঠিকানাটা লিখে নাও।' ঠিকানাটা বলল ছুটি।

'আপনাকে কি আমার স্বামী চেনেন?'

'এর উত্তর উনি দেবেন তোমাকে অথবা এখানে এলে সেটা জানতে পারবে। মনে রেখো আমার এখানে আসবে সন্ধ্যে ছ'টার পরে।' লাইনটা কেটে দিল সুবর্ণা।

রিভলভিং চেয়ারে বসে টিনা তাকে লক্ষ্য করছিল। চোখ বন্ধ করে জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছিল ছুটি। তারপর উঠে এসে হাত বাড়িয়ে টিনাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগল, 'বুঝলি টিনা। হাত থেকে তীর বেরিয়ে গেলে আর তো কিছু করার থাকে না। ধর, ওথেলো যখন সন্দেহ করে পাগল হয়ে গিয়েছিল তখন যদি কেউ ওর বুক থেকে আবেগ মুছে দিত তাহলে ডেসডিমনা মারা যেত না। আবেগের বাড়াবাড়ি মানুষকে অন্ধ করে দেয়। আমিও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম বলে এই অবস্থায় পৌঁছেছি।'

তারপর সময় গড়িয়ে যখন ঘড়ির কাঁটা ছ'টায় পৌঁছালো তখন তড়াক করে উঠে পাশের বন্ধ দরজা খুলে লেখা কাগজটা নিয়ে ঢুকে গেল ছুটি। অন্যদিন যা করেনা আজ তা করল। দরজা বন্ধ করার আগে অদ্ভুত দৃষ্টিতে ঘরটাকে দেখে নিল।

ডাক্তার বলেছেন সব ঠিক আছে, শুধু প্রেসারটা একটু হাই। কোনরকম টেনশন করতে তিনি নিষেধ করলেন। বাইরে বেরিয়ে এসে তুহিন জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার টেনশন কেন হচ্ছে?'

'হচ্ছে।'

'আরে বাচ্চা তো স্বাভাবিকভাবেই হবে।'

'সেজন্যে নয়।' গাড়িতে উঠল সুবর্ণা।

তুহিন গাড়ি চালু করতেই সে বলল, 'আমরা বাড়ির দিকে যাব না।'

'তাহলে?'

'যা বলছি সেভাবেই চালাও।'

'যথা আজ্ঞা।'

ঠিকানার কাছাকাছি পৌঁছে তুহিন জিজ্ঞাসা করল, 'এদিকে এলে কেন?'

কাগজে লেখা ঠিকানাটা এগিয়ে দিল সুবর্ণা, 'এখানে যাব।'

ঠিকানা দেখে চমকে উঠল তুহিন, 'এটা কোথায় পেলে?'

'কেন? তুমি এই ঠিকানায় যেতে চাইছ না?'

'সুবর্ণা, আমি বুঝতে পারিছ না—।'

'তোমাকে কিছু বুঝতে হবে না! ওই ঠিকানায় চল।'

'না।'

'কেন? তুমি কি ভয় পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'ওখানে গেলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'কেন?'

'না, মানে, তোমাকে তো বলেছি, এই ঠিকানায় ও থাকতো।'

হতভম্ব হয়ে গেল সুবর্ণা। এ কি বলছে তুহিন! চিত্রাঙ্গদা কি ওর প্রাক্তন প্রেমিকার নাম? অসম্ভব। তবু জিজ্ঞাসা করল, 'তার নাম কখনও বলনি।'

'ছুটি।'

'না। এখানে যিনি থাকেন তার নাম চিত্রাঙ্গদা।'

'চিত্রাঙ্গদা?' অবাক হল তুহিন।

'তাছাড়া সেই মহিলার তো বিয়ে হয়ে গেছে বলেছিলে। বল।'

তুহিনের কোন আপত্তি শুনল না সুবর্ণা।

ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ কিন্তু ঠেলতেই খুলে গেল। ভেতর থেকে একটানে অকেজো করে রেখেছিল। ঘরে আলো জ্বলছে। আর রিভলভিং চেয়ারে বসে আছে একটা বেড়াল। সুবর্ণা ডাকল, 'কেউ আছেন?'

কোন সাড়া এল না। তুহিন বলল, 'কেউ নেই, ফিরে চল।'

সুবর্ণা উত্তর না দিয়ে বাথরুমে গেল। সেটা যে অনেকদিন ব্যবহার করা হয়নি বোঝা যাচ্ছে। বেড়ালের পটিতে নোংরা হয়ে আছে। সে ফিরে এল। পাশের বন্ধ দরজা ঠেলল। ওটা খুলে যেতে অন্ধকার ঘর দেখল।

হাতড়ে হাতড়ে সুইচ খুঁজে পেয়ে আলো জ্বালতে দেখা গেল ঘরে কেউ নেই। তারপরেই চোখে পড়ল খাটের ওপর একটা কফিন পড়ে আছে। তারপাশে টেবিলের ওপর ভাঁজ করা কাগজ পেপার ওয়েটের তলায়। সে এগিয়ে গিয়ে কাগজটা তুলল।

'সুবর্ণা, প্রথমে আমি ক্ষমা চাইছি তোমাকে বিরক্ত করেছি বলে। আমি এখন এই কফিনের ভেতর শুয়ে আছি। রোজ সন্ধ্যে ছ'টা থেকে ভোর-ছ'টা পর্যন্ত শুয়ে থাকতে হয় আমাকে। আমার বিশ্বাস তুমি এঘরে এসেছ এবং এই লেখা পড়ছ। আমার আসল নাম ছুটি, চিত্রাঙ্গদা নয়। চিত্রাঙ্গদা আমার ছদ্মনাম। ওই নাম নিয়ে আমি মেয়েদের জন্যে কিছু করতে চেয়েছিলাম। যাক সে কথা।

তোমার স্বামীকে আমি ভালবাসতাম। দু'বছর আমরা ঘনিষ্ঠ ছিলাম। তারপর হঠাৎ শুনলাম আমি খৃষ্টান বলে তার বাড়ির লোকরা আমাকে গ্রহণ করবে না। অনেক কান্নাকাটি করেছিলাম। ও সম্পর্ক শেষ করতে বলেছিল আমি মন থেকে পারিনি। এর মধ্যে যে ও তোমাকে বিয়ে করে ফেলেছে, তাও জানায়নি। যখন জানতে পারলাম তখন বোকার মত, স্রেফ বোকার মত আত্মহত্যা করলাম। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, আমার অতৃপ্তি, আমার মনের জ্বালা থেকে মুক্তি পেলাম না। আমি স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে আসি কফিন থেকে। কারণ একগাদা ঘুমের ওষুধ খেয়ে ওই কফিনেই শুয়ে পড়েছিলাম। কফিনটা কিনে এনেছিলাম আগেই। আবেগের বাড়াবাড়ি আমার চৈতন্য লোপ করে দিয়েছিল। ওই জুলুনি নিয়ে যেমন তোমাকে ফোন করে বিরক্ত করেছি আবার তাকে সামাল দিতে মেয়েদের উপকার করেছি। আজ তোমার বাড়িতে গিয়ে তোমায় দেখে বুঝলাম কি ভুল করতে চলেছিলাম। তুমি মা হতে চলেছ। তাই তোমার ওপর আমার কোন রাগ নেই।

তিনটে অনুরোধ। আজ রাত্রের মধ্যে আমার কফিনটাকে কবর দিও। যাতে কাল ভোর হলে আমি আবার না বেরিয়ে আসতে পারি। এই কদিন যে কি যন্ত্রণা পেয়েছি! আয়নায় আমার ছায়া পড়ে না, কেউ কিছু দিলে খেতে পারিনা, কেটে গেলে রক্ত বের হয় না। আমি মুক্তি চাই। তুমি আমার এই উপকারটা কর।

দ্বিতীয়টি, আমার বেড়ালটার নাম টিনা। খুব ভাল বেড়াল। ওকে নিয়ে যেও।

তৃতীয়টি, তোমার স্বামীকে ক্ষমা করে দিও। ওকে আর একটা সুযোগ দাও।

সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। ছুটি'।

সুবর্ণা ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে এসে টিনার দিকে হাত বাড়াল। একটু ইতস্তত করেও টিনা ধরা দিল। তাকে কোলে নিয়ে সুবর্ণা বলল, 'ছুটিকে সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে যেতে হবে আজ রাত্রেই। যে করে হোক ব্যবস্থা কর।'

'রাত্রে কি এসব হয়?' তুহিন প্রথম কথা বলল।

'করতেই হবে। যে করেই হোক।' জোর গলায় বলল সুবর্ণা। টিনা তখন অবাক হয়ে আয়নার দিকে তাকিয়েছিল। এই কদিন ধরে ছুটি যখনই তাকে কোলে নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আদর করেছে তখনই সে নিজের প্রতিবিম্ব দেখেছে, ভাবছে, যার কোলে ছিল তার প্রতিবিম্ব আয়নায় প্রতিফলিত হয়নি।

আজ হয়েছে। সুবর্ণাকেও আয়নায় দেখতে পাচ্ছে সে।

সহযাত্রী

সন্ধ্যালগ্নে বিয়ে। বর আসবে শিলিগুড়ি থেকে। আসতে হবে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে। তখন আশীর্বাদ, সাড়ে সাতটায় বিয়ে শেষ করতে হবে। সত্যব্রত তাঁর শ্যালক গোবিন্দর সঙ্গে বসে কথা বলছিলেন। এখন বিকেল তিনটে। সকালে ছেলের বাড়ি থেকে গায়ে হলুদের তত্ত্ব এসে গিয়েছে। সে সব দেখে মেয়েরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

আজ সকালেই সত্যব্রতবাবু সপরিবারে 'উৎসবে' এসেছেন। উৎসব একটি জাঁকালো বিয়ে বাড়ির নাম। কবছর আগেও জলপাইগুড়ির মানুষ বিয়ের জন্য বাড়ি ভাড়া করত না, ক্যাটারার ডাকত না। এখন প্রয়োজন হয়েছে। পরিশ্রম বাঁচাতে কে না চায়। আজ সন্ধের পাট চুকলে খাওয়া দাওয়া শেষ করতে রাত হবে। কাল সকালে বাসি বিয়ের পর মেয়ে-জামাই চলে যাবে শিলিগুড়ি। উৎসবের মালিক হরিপদ মিত্র বলেছেন, 'নিয়ম হল সকাল নটায় বাড়ি খালি করে দেওয়া, আপনি না হয় এগারোটা পর্যন্ত রাখবেন।'

গোবিন্দ বলল, 'জামাইবাবু, আজ দুপুরে বাযট্টিজন খেয়েছে।'

'বাযট্টি?' সত্যব্রত অলস গলায় বললেন। কাজের বাড়ি বলেই একটু দেরিতে খাওয়া হয়েছে। একমাত্র মেয়ের বিয়েতে কোনও ফাঁক রাখতে চান না বলেই এখন বাড়ি না গিয়ে থেকে গেছেন বিয়ে বাড়িতে। গোবিন্দ বলল,'বিকেলটা চায়ের ওপর সারবো, আপনি আবার জলখাবার দিতে বলবেন না। দিদি বলেছেন আমাকেই সব ম্যানেজ করতে হবে।'

'বিস্কুটটা দিও।'

'সেটা দেখা যাবে।' গোবিন্দ মাথা নাড়ল, 'বর আনতে কে যাচ্ছে?'

'বর? ও হ্যাঁ। এটা তুমি এতক্ষণে বললে?' সোজা হয়ে বসলেন সত্যব্রত।

'আশ্চর্য! আপনার মেয়ের বিয়ে আর আমি সব মনে করিয়ে দেব? সেই গৌহাটি থেকে ছুটে এলাম ভাগ্নীর বিয়ে বলে, আমার সব মনে থাকবে?' গোবিন্দ প্রতিবাদ করল।

'হুঁ। গাড়ি নিয়ে তুমিই বরং চলে যাও।' সত্যব্রত জানালেন।

'আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে জামাইবাবু। আমি গেলে এদিকটা কে সামলাবে?'

'তাও ঠিক।'

'আপনার ছেলেদের পাঠান।'

'ওদের ওপর আমার আস্থা নেই গোবিন্দ। চালিয়াৎ বন্দর এক একজন।'

'অনেকদিন পরে শব্দটা শুনলাম। ঠিক আছে, আমি দেখছি।'

সত্যব্রতর দুই পুত্রের বয়স একুশ এবং কুড়ি। দুজনেই কলকাতায় পড়ে। বেশ ঝকঝকে। তাদের ডেকে আনা হলে গোবিন্দ হুকুমটি জানালো, 'এখন তিনটে দশ। গাড়ি নিয়ে সোজা চলে যাও কদমতলায়। ওখানে ফুল দিয়ে সাজাতে বড় জোর কুড়ি মিনিট। সাড়ে চারটের মধ্যে পৌঁছে যাবে শিলিগুড়িতে। বরপক্ষকে বলা আছে। বরযাত্রীরা আসবে বাসে। বর এবং একজনকে নিয়ে তোমরা সোজা চলে আসবে এখানে। আর হ্যাঁ, জলপাইগুড়ির মোড়ে পৌঁছে একটা ফোন করে দিও ফোন বুথ থেকে। মেয়েরা রেডি থাকবে বরণ করার জন্য।'

ইন্দ্রনীল এবং স্বপ্ননীলের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল তারা এই প্রস্তাব পছন্দ করছে না। সেটা লক্ষ্য করে সত্যব্রত বললেন, 'কোনও আপত্তি শুনব না। তোমাদের দিদির বিয়ে, দয়া করে এই কাজটুকু কর।'

সুমো গাড়িতে প্রচুর জায়গা থাকে, অতএব আরও দুজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে নিল দুই ভাই। কদমতলার ফুলের দোকান গাড়ি সাজাতে সময় নিল। বাপের কাছে ওই বাবদ যে টাকা পাওয়া গিয়েছিল তা থেকে বাঁচিয়ে ওরা ফেনিল কফি খেল। শিলিগুড়ির হংকং মার্কেটে বিদেশি জুতা কেনার পরিকল্পনা করল। তারপর ঘড়ি দেখে লাফিয়ে উঠল। বরকে নিয়ে আসতে হবে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে, এখনই চারটে পনের।

ড্রাইভারকে ছুটি দিয়েছে ওরা, ইন্দ্রনীল চালাচ্ছে। গান বাজছে টেপে। শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিটে পৌঁছানো যায় যদি রাস্তায় গাড়ি কম থাকে। কিন্তু আজই গাড়ির ভিড় দেখা গেল। স্বপ্ননীল বলল, 'সোজা না গিয়ে বাইপাশ ধর দাদা। সময় বাঁচবে।'

এক বন্ধু বলল, 'বাইপাশ ধরলে হংকং মার্কেটে যাবি কি করে?'

'আর হংকং মার্কেট। পাঁচটার মধ্যে শিলিগুড়িতে পৌঁছতেই হবে। বর নিয়ে ফিরতে না হয় পৌনে ছটা বাজবে। তাতেই ফাদারের গালাগাল শুনতে হবে।' ইন্দ্রনীল বলল।

'মিছিমিছি কফি খেয়ে সময় নষ্ট করলি।' স্বপ্ননীল বলল।

'তুই চুপ কর। আমি ঠিক সময় পৌঁছে যাব।' ইন্দ্রনীল গম্ভীর গলায় বলল।

দুই ভাই পাত্রের বাড়িতে কখনও যায়নি। ফলে পাড়া এবং বাড়ি খুঁজতে সময় লাগল।

বাড়ির সামনে বিশাল বাস দাঁড়িয়ে রয়েছে। সানাই বাজছে, গেট ফুলে সাজান। বরের গাড়ি দেখে বেরিয়ে এল লোকজন। ওরা গাড়ি থেকে নেমে সবিনয়ে বলল, 'বাবা পাঠিয়েছেন, বর নিয়ে যেতে।'

বরের বাবা অস্বস্তিতে পড়লেন, 'তোমাদের দেরি দেখে আমরা আর ঝুঁকি নিলাম না। তোমার বাবা বলেছিলেন যে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে পৌঁছাতে হবে তাই ওকে রওনা করে দিয়েছি। দশ মিনিট হয়ে গেল।'

'তা হলে?' স্বপ্ননীল হতাশ হল।

'কেন? তোমরা আসার সময় কোনও ফুলে সাজানো গাড়িকে জলপাইগুড়ির দিকে যেতে দেখোনি?'

'না তো!' স্বপ্ননীল মাথা নাড়ল।

ইন্দ্রনীল বলল, 'আমরা হাতিমোড় থেকে বাইপাশ ধরেছিলাম, ওরা বোধহয় হাইওয়ে ধরে গেছে।'

বাড়ির মেয়েরা বাসে উঠছিল। ইন্দ্রনীল বলল, 'আর কি হবে, আপনারা ইচ্ছে করলে কেউ কেউ আমাদের গাড়িতে আসতে পারেন।'

বরের বাবা বললেন, 'না, না। আমরা সবাই একসঙ্গে যাব।'

'তা হলে আমরা আসি—।'

'একটু মিষ্টি মুখ করে যাও।'

'না, না। আমাদের খুব তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।'

শিলিগুড়ির জনবহুল রাস্তায় যতটা দ্রুত সম্ভব গাড়ি চালিয়ে বাইপাশ ধরল ইন্দ্রনীল। স্বপ্ননীল বলল, 'এখন কী হবে?'

'বরের গাড়ি আর কত জোরে যাবে? আমরা বাইপাশ দিয়ে স্পিড বাড়িয়ে যদি যাই তা হলে বরের গাড়ি জলপাইগুড়িতে ঢোকার মুখেই ওদের ধরে ফেলব। তোরা চুপচাপ দ্যাখ।' ইন্দ্রনীলের কথা শেষ হওয়ামাত্র গাড়ি যেন উড়তে লাগল। একেই বাইপাশ, তারওপর সন্ধের মুখ বলে সামনে তেমন গাড়ি নেই। স্বপ্ননীলের সঙ্গে তিন বন্ধু চিৎকার করে গান ধরল টেপ রেকর্ডারের সঙ্গে গলা মিলিয়ে। হু হু করে গাড়িটা ছুটে যাচ্ছিল।

উলু এবং শঙ্খ বাজিয়ে বরকে বরণ করা হল। গোবিন্দ দেখল বরের সঙ্গে দুজন মহিলা আর এক ভদ্রলোক নামলেন। বরকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা এই গাড়িতে এলেন, আমাদের ছেলেরা পৌঁছায়নি?'

'না তো ! কেউ আসছে না অথচ সময় বয়ে যাচ্ছে দেখে আমরাই রওনা হলাম।'

'বেশ করেছেন। কিন্তু আমরা যাদের পাঠিয়েছি তারা তো অনেকক্ষণ আগে বেরিয়েছে।' বলেই গোবিন্দ তার জামাইবাবুকে ঘটনাটা জানিয়ে দিল। সত্যব্রত অত্যন্ত কুণ্ঠিত হলেন। করজোড়ে ক্ষমা চাইলেন ভদ্রলোকের কাছে। ভদ্রলোক উদার হলেন, 'ছি ছি। এসব বলবেন না। হয়তো ওদের গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে, অনেক কারণ ঘটতে পারে। এটা নিয়ে কোনও তিক্ততা কাম্য নয়, আমরাও কিছু মনে করিনি।'

বরকে বসানো হয়েছে বরাসনে। সেখানে মেয়েদের ভিড় উপচে পড়ছে। অতিথিদের আগমন শুরু হয়ে গেল। বর দেখে এসে অনেকেই সত্যব্রতবাবুর কাছে প্রশংসা করে যাচ্ছেন।

'ছেলে কি করে?'

'কম্প্যুটার সায়েন্স নিয়ে পাস করে কলকাতায় বড় চাকরি করছে।'

'শিলিগুড়ির ছেলে শুনলাম?'

'হ্যাঁ। ওদের বাড়ি শিলিগুড়িতে। হঠাৎই আমার বন্ধু সম্বন্ধটা আনলো। শুনেছি বিয়ের মাস ছয়েক বাদে বউ নিয়ে বিদেশে যাবে চাকরি করতে।'

'বাঃ! কপালগুণে ভাল জামাই পেয়েছেন।'

'হে হে।'

এইসব কথার জবাব দিতে দিতে সত্যব্রত ছুটলেন ভেতরে। সেখানে টেবিল পড়েছে। ক্যাটারার ছেলেটি এখন জলপাইগুড়িতে খুব নাম করেছে। তাঁকে দেখেই ছুটে এল, 'বলুন মেসোমশাই!'

'সব ঠিক আছে তো?' সত্যব্রত জানতে চাইলেন। 'দ্যাখো শ্যামল—!'

'এদিকটা নিয়ে আপনি একদম মাথা ঘামাবেন না। আপনার অসম্মান মানে জলপাইগুড়ির অসম্মান। স্পেশ্যাল পাবদা আনিয়েছি। এক একটা প্রায় একফুট। বরযাত্রীদের খাওয়ার সময় বলবেন, গলদা চিংড়ির মালাইকারি খাওয়াবো।' শ্যামল হাসলো।

'এ্যাঁ! এটা তো কথা ছিল না হে। চিংড়ি দিতে আমি বলিনি।'

'দিলে কি খুব অসুবিধে হবে? ' শ্যামল ঘাবড়ে গেল যেন।

'না। তা কেন হবে? দামটা তো দিতে হবে আমাকেই। এমনিতেই তো দুরকমের মাছ আর মাংস আছে।' সত্যব্রত খুব বিরক্ত বোধ করলেন।

'ও! না না, চিংড়ির দাম আপনাকে দিতে হবে না মেসোমশাই।'

'সে কি? কেন?'

'বরযাত্রী তো জনা সত্তর। আমি একশজনের ব্যবস্থা করেছি। এই চিংড়িটা ওদের আমার তরফে জলপাইগুড়ির উপহার। যান, ওদিকটা দেখুন।' শ্যামল ফিরে গেল তার কাজে।

বাইরে তখন এসেছে এসেছে চিৎকার। কি এসেছে, না, বরযাত্রীর বাস এসে গেছে। গোবিন্দ কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করছে। সত্যব্রত এগিয়ে এসে বরকর্তা সতীনাথবাবুকে নমস্কার জানালেন। সতীনাথ বললেন, 'চন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই এসে গেছে!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনেকক্ষণ। আশীর্বাদ হয়ে গেলেই বিয়ের কাজ শুরু হয়ে যাবে। পথে কোনও কষ্ট হয়নি তো? যা রাস্তাঘাটের অবস্থা!' সত্যব্রত জিজ্ঞাসা করলেন।

'না না, টানা চলে এসেছি। ওহো, চন্দ্রনাথ চলে আসার মিনিট দশেক পরে আপনার ছেলেরা বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে আমার ওখানে হাজির। বর চলে এসেছে শুনে খুব লজ্জায় পড়েছিল বেচারারা। পড়ি মড়ি করে ছুটে এসেছে বোধহয়।' সতীনাথ জানালেন।

ছেলে দুটোর মুণ্ডপাত করবেন এমন অবকাশ পেলেন না সত্যব্রত। আশীর্বাদের পালা চুকোতে হল। ছেলেকে তিনি ঘড়ি, আংটি দিলেন, ওঁরা মেয়েকে দিলেন হিরের আংটি, হিরে বসানো কানের দুল। পাত্রপক্ষের প্রশংসা শুরু হয়ে গেল বিয়ে বাড়িতে। সত্যব্রত ভাবতে পারেন নি এতটা। বিয়ের কাজ শুরু হয়ে যাবার পর এক ফাঁকে তিনি গোবিন্দকে ধরলেন। গোবিন্দ তখন খেতে বসা প্রথম ব্যাচকে দেখাশোনা করছিল। একটু নির্জনে নিয়ে গিয়ে তিনি মনের ঝাল ঝাড়লেন শালার ওপর। 'তোমার ভাগ্নেদের কাণ্ড দেখেছ তো? বন্ধুদের নিয়ে শিলিগুড়ি গিয়েছে ফুর্তি করতে। এ সব তোমার দিদির প্রশ্রয়ে হয়েছে। আদর দিয়ে তিনি তাঁর ছেলেদের মাথা খেয়ে ফেলেছেন।'

'ওরা এখনও ফেরেনি?' গোবিন্দ জানতে চাইল।

'ফিরলে আমি জুতো পেটা করব।'

'না না, জামাইবাবু, বিয়ে বাড়িতে ওসব করবেন না।'

'তুমি দ্যাখো গোবিন্দ, আমার সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিল ওরা? আমরা বর নিয়ে আসব বলেছিলাম, কথা রাখতে পারলাম না। ছি ছি ছি।'

'তাতে তেমন হেরফের হয়নি। পাত্রপক্ষ ভাল মানুষ!'

'আজ হয়নি, এখন হয়নি, দশ বছর পরে যে মেয়েকে জামাই কথা শোনাবে না তার কি গ্যারান্টি আছে?'

'তা অবশ্য নেই। আপনি এখনও দিদিকে কথা শোনান। কিন্তু প্রশ্ন হল, বরযাত্রীর বাস ফিরে এল, ওরা এল না কেন? কোথায় কি করছে?' গোবিন্দ কথা ঘোরাবার চেষ্টা করল।

'কি আর করবে? তোমার ভাগ্নে তো। দেখছে বর চলে গেছে, ওদের আর কোনো কর্তব্য নেই, এখন শিলিগুড়িতে বসে ফুর্তি করছে বন্ধুদের নিয়ে।' সত্যব্রত কথা শেষ করতেই ডাক এল। বরের বাবা কিছু বলবেন।

ছাঁদনা তলায় বেশ ভিড়। বর বসে আছে পিঁড়িতে। দুই পুরোহিত দুপাশে মুখোমুখি। সত্যব্রতকে দেখে সতীনাথবাবু বললেন, 'কি মুশকিল বলুন দেখি।'

'কি হয়েছে?'

'সমস্যা দুটো। আপনি আমাকে বলেছিলেন হিন্দুমতে বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর সরকারি আইনে রেজেস্ট্রি করা হবে। তাই তো?'

'হ্যাঁ। তাই আমি রেজিস্ট্রারকে আটটা নাগাদ আসতে বলেছি।' সত্যব্রত বললেন।

'এদিকে হঠাৎ আমার কাকা বায়না ধরেছেন, ওটাই নাকি আসল বিয়ে, ওটা আগে সেরে নেওয়া যাক। বুড়ো মানুষ, বরযাত্রী এসেছেন, কি করে ম্যানেজ করি! আপনি যদি একটু বুঝিয়ে বলেন।' সতীনাথবাবু তাঁকে নিয়ে এলেন কিছুটা দূরে বসা বৃদ্ধের কাছে।

'কাকাবাবু, ইনি সত্যব্রতবাবু, কনের বাবা।'

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই বৃদ্ধ বললেন, 'এখন আইন হয়েছে সই করা বিয়ে হল আসল বিয়ে। এগুলো নেহাতই স্ত্রী আচার, লোকাচার। বুঝলে হে! কাঁপা কাঁপা গলায় থেমে থেমে বললেন বৃদ্ধ।

'নিশ্চয়ই। কিন্তু যিনি সই করাবেন তিনি আটটার আগে আসতে পারবেন না।'

'সেকি? সরস্বতী পুজোর পুরুত নাকি ?'

হেসে ফেললেন সত্যব্রত, 'অথচ লগ্ন শেষ হয়ে যাবে সাড়ে সাতটার মধ্যে। আর বেশি সময় নেই। আপনি যদি অনুমতি দেন তা হলে বিয়েটা শুরু হতে পারে।' সত্যব্রত হাত জোড় করলেন।

বৃদ্ধ তাঁর শীর্ণ হাত শূন্যে ঘোরালেন, 'ও হ্যাঁ, বিয়েটা হবে কাদের মতে?'

'তার মানে?' সত্যব্রত সতীনাথবাবুর দিকে তাকালেন।

সতীনাথ বললেন, 'ওই যে একটু আগে যে সমস্যার কথা বলেছিলাম। আপনাদের পুরোহিতের সঙ্গে আমাদের পুরোহিতের মতান্তর হয়েছে। দুজনেই নিজের মতে চলতে চাইছেন।'

'একি কথা! চলুন, কথা বলি।' সত্যব্রত এগিয়ে গেলেন, 'কি হয়েছে পুরুতমশাই।'

সত্যব্রতর পুরোহিত প্রবীণ মানুষ। দীর্ঘকাল তাঁদের কাজগুলো করে দেন। তুলনায় বরপক্ষের পুরোহিত বয়সে তরুণ। প্রবীণ বললেন, 'কি বলব! সেদিনের ছোকরা আমাকে জ্ঞান দিচ্ছে এভাবে নয় ও ভাবে করতে হবে। আরে এখন পর্যন্ত সাতশো সত্তরটা বিয়ে দিয়েছি। আমাকে জ্ঞান দেওয়া।'

যুবক পুরোহিত বললেন, 'তা হলে বলব, ওই সব বিয়ে শাস্ত্রসম্মত হয়নি।'

'দেখুন, দেখুন সত্যব্রতবাবু, আমাকে অপমান করছে। শিলিগুড়ি থেকে এসে জলপাইগুড়িতে অপমান।' চিৎকার করে উঠলেন প্রবীণ।

সত্যব্রত হাতজোড় করলেন, 'আপনি ওঁর চেয়ে বয়সে বড়। তার ওপর ওরা অতিথি। কেউ কাউকে খামোকা কেন অপমান করবে! ভুলভ্রান্তি তো হয়ই।'

সতীনাথবাবু বললেন, 'আমাদের পুরোহিত সংস্কৃতে এম.এ। ওঁর বাবা নামকরা পুরোহিত ছিলেন। ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।'

এই সময় গোবিন্দ কাছে এসে ফিসফিস করে কিছু বলতেই সত্যব্রত মেয়েদের ভিড়টার দিকে তাকালেন। তারপর পায়ে পায়ে সেদিকে এগিয়ে যেতেই স্ত্রীর দর্শন পেলেন তিনি, 'কি ব্যাপার?'

'বিয়েটা আমাদের ঠাকুরমশাই দেবেন। তুমি আবার ওদের কথায় হ্যাঁ করে বসো না।' স্ত্রী বেশ তেজের সঙ্গে অথচ চাপা গলায় নির্দেশ দিলেন।

'এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে—!'

'ওঁর বাবা আমাদের বিয়ে দিয়েছিলেন, মনে নেই।' ঝাঁঝিয়ে উঠলেন স্ত্রী।

ফিরে এলেন সত্যব্রত। সতীনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'অন্দরমহলের বক্তব্য কি?'

সত্যব্রত অস্বস্তিতে পড়লেন, 'ওঁর ইচ্ছে যেহেতু আমাদের বিয়ে যিনি দিয়েছিলেন তাঁর ছেলে হলেন এই পুরোহিত তাই—।'

ভদ্রলোক হাসলেন, 'আরে তাই নাকি? তা হলে এক কাজ করা যাক। আপনার পুরোহিত বিয়েটা দিন, আমাদের পুরোহিত বাসি বিয়ে দেবেন।'

'বেশ তো।'

সত্যব্রত দেখলেন তাঁদের পুরোহিতের মুখে হাসি ফুটল। পুরোহিত বললেন, 'গোত্রান্তর হয়ে যাওয়ার পর তো আমাদের হাত থেকে বেরিয়ে যাবে। তা বাসি বিয়ে হবে কোথায়? এখানে না শিলিগুড়িতে?'

বরপক্ষের পুরোহিত বললেন, 'শিলিগুড়িতে।'

সতীনাথবাবু বললেন, 'কিন্তু সেখানে তো কোনও ব্যবস্থা করা নেই। কথা ছিল এখানেই সেসব শেষ করে ফিরব।'

বরপক্ষের পুরোহিত বললেন, 'ব্যবস্থা করতে বেশি সময় লাগবে না। আজ যখন বরযাত্রীরা ফিরে যাবে আমি তখন ওদের সঙ্গে নিয়ে সব আয়োজন করে রাখবো।'

বিয়ে শুরু হয়ে গেল।

অতিথিরা আসছেন। বিয়ে বাড়ি জমজমাট। তার এক ফাঁকে গোবিন্দকে ধরলেন সত্যব্রত, 'হারামজাদারা এসেছে? এলে বলবে আমার ধারে কাছে না আসতে। পাত্রপক্ষ অত্যন্ত ভদ্রলোক বলে বেঁচে গেলাম।' গোবিন্দ মাথা নেড়ে ছুটল আর একটা দিক সামাল দিতে।

কনেকে নিয়ে আসা হল ছাঁদনাতলায়। বেনারসীতে তাকে আজ আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। কনের নাম দিয়া। বিয়ের পিঁড়িতে বসানো হল তাকে। সম্প্রদান করবেন সত্যব্রতর ছোটভাই। পুরোহিত কাজ শুরু করলেন।

পুলিশের গাড়িটা বিয়ে বাড়ির সামনে একটু থেমে এগিয়ে গেল। এখন রাত। রাস্তায় লোকজন কম। যা কিছু ভিড় তা বিয়ে বাড়ির সামনে। জিপ থেকে যে অফিসার নেমে এলেন তাঁর পরনে ইউনিফর্ম নেই। বিয়ে বাড়ির গেটে এসে ইতস্তত করছিলেন তিনি। পাড়ার একটি ছেলে তাকে অভ্যর্থনা জানাল, 'আসুন আসুন, মেজবাবু।'

সেকেণ্ড অফিসার হাত নাড়লেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

সে সময় সত্যব্রতবাবুর এক প্রতিবেশী নেমন্তন্ন খেয়ে বেরুচ্ছিলেন যাঁকে সেকেণ্ড অফিসার ভাল করে চেনেন। তাঁকে দেখামাত্র তিনি যেন হাতে পাঁজি পেলেন। ভদ্রলোকের হাত ধরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে খানিকটা নির্জনে গিয়ে নিচু গলায় কিছু বলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি করি বলুন তো?'

ভদ্রলোক কোনও মতে বলতে পারলেন, 'সর্বনাশ!'

'বিয়ে হয়ে গিয়েছে?' সেকেণ্ড অফিসার জানতে চাইলেন।

'না, সম্প্রদান চলছে।'

'তার মানে আধঘণ্টা বাকি। এক কাজ করি, আধঘণ্টা বাদে ঘুরে আসি।'

'সেই ভাল, সেই ভাল।' কথা দুটো বলে ভদ্রলোক দ্রুত পা চালালেন। অফিসার তার জিপ নিয়ে চলে গেলেন পাড়া ছেড়ে।

ছাঁদনাতলায় শুভদৃষ্টি এবং মালাবদল হয়ে গেল। শঙ্খ এবং উলুধ্বনিতে বিয়ে বাড়ি মুখরিত।

বিয়ে বাড়ির ঠিক পাশের দোতলা বাড়িটি রবীনবাবুর। তাঁর বাড়ির লোকজন আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছে বিয়ে বাড়িতে। তিনি বাড়ি পাহারা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর ফোন বাজল। ফোনের বক্তব্য শুনে চিৎকার করে উঠলেন তিনি। তাঁর আর্তনাদের আওয়াজ বিয়ে বাড়ির আওয়াজ ছাপিয়ে অনেকের কানে এল। কোনও বিপদ হয়েছে বুঝে কয়েকজন ছুটে গেল ওই বাড়িতে। সদর দরজা বন্ধ। সবাই কারণ জিজ্ঞাসা করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত কাঁদতে কাঁদতে বারান্দায় এলেন ভদ্রলোক, 'খোকা হাসপাতালে। এইমাত্র সেখান থেকে ফোন এসেছিল। খুব খারাপ অবস্থা। ওকে চিনতে পেরে একজন ফোন করেছিল।'

'হাসপাতালে কেন? কি হয়েছে?'

'আমি জানি না, আমি জানি না।'

এই সময় পুলিশের গাড়িটা ফিরে এল। গাড়ি থেকে নেমে সেকেণ্ড অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিয়ে হয়ে গিয়েছে?'

'হ্যাঁ, কেন বলুন তো?' গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করল।

'বাড়ির গার্জেনদের কাউকে ডাকুন।'

'আমি মেয়ের মামা, আমাকে বলুন।'

'ও। আজ সন্ধ্যাবেলায় শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ির বাইপাশে একটা অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে। তিনজন স্পট ডেড। একজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সুমো গাড়ির নাম্বার অনুযায়ী বোঝা যাচ্ছে ওর মালিক সত্যব্রতবাবু।' সেকেণ্ড অফিসার জানালেন।

শোনামাত্র গোবিন্দ চিৎকার করে উঠল। লোকজন বেরিয়ে আসতে লাগল বিয়ে বাড়ি থেকে। সত্যব্রত 'কি হয়েছে, কি হয়েছে?' বলে ছুটে এলেন। গোবিন্দ তাঁকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল, 'সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে জামাইবাবু, সুমো অ্যাকসিডেণ্ট করেছে।'

'সেকি?' সত্যব্রত টলতে লাগলেন।

'ইন্দ্রনীল, স্বপ্ননীলের সঙ্গে ওদের দুই বন্ধু ছিল। ইনি বলছেন তিনজন স্পট ডেড।'

গোবিন্দর কথা শেষ হওয়া মাত্র সত্যব্রত মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। খবর পৌঁছে গেল ভেতরবাড়িতে। কান্নার রোল উঠল। উন্মাদিনীর মত ছুটে এলেন সত্যব্রতর স্ত্রী, 'কে বলেছে, কে বলেছে আমার ছেলেরা মরে গেছে, বিশ্বাস করি না আমি।'

'দেখুন একজন বেঁচে আছে। সে আপনার ছেলে কিনা আমি জানি না।' অফিসার বললেন।

'আমার ছেলে, আমার ছেলে বেঁচে আছে এখনও।' দোতলা থেকে রবীনবাবু চিৎকার করলেন। শোনামাত্র সত্যব্রতর স্ত্রী জ্ঞান হারালেন। ওঁদের ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হল। কেউ একজন চিৎকার করল, 'শালা, এই বরটাই অপয়া।'

আর একজন ধমকালো, 'আঃ, পুরুষমানুষ কখনও অপয়া হয়?'

গোবিন্দ বলল, 'ওসব জানি না। তবে বর যদি সাততাড়াতাড়ি বেরিয়ে না আসত, ওদের গাড়িতে আসতো তা হলে এই অ্যাকসিডেন্টটা হতো না।'

সত্যব্রতর ভাই দেবব্রত বললেন, 'এখন কি হবে? বিয়েটা—।'

'বিয়ে? আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে দেবুদা।' গোবিন্দ চিৎকার করল, 'দুই ভাই মর্গে শুয়ে আছে, আর মেয়ের বিয়ে হবে? ইস, একটু আগে যদি জানা যেত।'

একজন বলল, 'পুলিশ কিন্তু আধঘণ্টা আগে এসেছিল, তখন কিছু বলেনি।'

'এ্যাঁ!' গোবিন্দ ছুটে গেল সেকেণ্ড অফিসারের সামনে, 'আপনি এসেছিলেন? খবরটা নিয়ে এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ, কিন্তু—।'

'কিন্তু কি? বলুন, বলুন।'

'তখন শুভকাজ শেষ হয়নি। খবরটা দিলে বিয়ে হবে না, কনে বিপদে পড়ে যাবে ভেবে ফিরে গিয়েছিলাম। আপনাদের ভাল করতে চেয়েছিলাম আমি।'

'ভাল করতে চেয়েছিলেন? মেয়েটাকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে গেছেন।' একজন মুঠো তুলল আকাশে, 'তখন জানালে বিয়েটাই হতো না। বেঁচে যেত মেয়েটা।'

'সেকি!' অফিসার অবাক।

'এ রকম অপয়া ছেলের বউ হতে হতো না। আপনার বিরুদ্ধে এস. পির কাছে আমরা কমপ্লেন করব। যা খুশি তাই আপনি করতে পারেন না।'

ছাঁদনাতলায় বর বসেছিল চুপচাপ। তার আশেপাশে বরযাত্রীদের দল মুখ নিচু করে রয়েছে। একটু আগে মুকুট মালা খুলে ফেলে কনে ছুটে গেছে অন্দরমহলে কাঁদতে কাঁদতে। সতীনাথবাবু গম্ভীর হয়ে আছেন। কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

যাঁরা খেতে বসেছিলেন তাঁরা সবে ডাল শেষ করেছেন। খবরটা পৌঁছনো মাত্র শ্যামল নিষেধ করেছে পরিবেশন করতে। নিমন্ত্রিতদের অনেকেই উঠে

দাঁড়িয়েছেন। কেউ কেউ ভেবে পাচ্ছেন না কি করবেন! শেষ পর্যন্ত তাঁরাও উঠে দাঁড়ালেন। শোকের বাড়িতে আনন্দ করে খাওয়া যায় না। মাথা নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা।

চন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। সতীনাথ তাঁর সঙ্গে আসা পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন কি করণীয়? বিয়ে কি সম্পূর্ণ হয়েছে?'

'প্রায় হয়ে গেছে। যজ্ঞ বাকি আছে, বাসি বিয়ে, সিঁদুর দান ইত্যাদি করতে হবে।'

'কিন্তু এখন এই পরিস্থিতিতে —।'

'ওগুলো আমাদের ওখানে গিয়ে করলেই হবে।' পুরোহিত আশ্বস্ত করলেন।

সতীনাথবাবু একজনকে সঙ্গে নিয়ে সত্যব্রতর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। সত্যব্রতর জ্ঞান ফিরে এসেছে। পাথরের মত বসে আছেন তিনি। তাঁকে ঘিরে আছে কয়েকজন। হাসপাতালে চলে গেছেন দেবব্রত কয়েকজনকে নিয়ে।

সতীনাথ বললেন, 'যা ঘটেছে তার জন্য কোনও সমবেদনা জানাবার ভাষা আমার জানা নেই। এরকমটা যে হবে আমি ভাবতে পারিনি। আপনাদের অবস্থা বুঝতে পারছি আমি।'

'তখন বুঝলেন না কেন?' গোবিন্দ ধমকে উঠল, 'কেন ছেলেকে আগেভাগে পাঠালেন?'

'আসলে সত্যব্রতবাবু বলেছিলেন সাড়ে পাঁচটার মধ্যে আসতে, সময় চলে যাচ্ছিল,—।' মাথা নাড়লেন সতীনাথ, 'এখন মনে হচ্ছে ওই গাড়িতে আমরা এলে হয়তো দুর্ঘটনা ঘটতো না। ওরা নিশ্চয়ই খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে ফিরছিল।'

সত্যব্রতর বুক থেকে হাহাকার বেরুলো, 'হা ভগবান।'

সতীনাথ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'আমার এই মুহূর্তে বলতে খুব খারাপ লাগছে, কিন্তু এটাও তো বাস্তব, বাস্তবকে অস্বীকার করি কি করে?'

সত্যব্রত মাথা নাড়লেন, 'আমি কিছু জানি না, জানি না।' ফুঁপিয়ে উঠলেন তিনি।

গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি বলতে চাইছেন?'

সতীনাথ বললেন, 'এই অবস্থায় বাসর বা অন্যান্য স্ত্রী আচারের কথা আমি ভাবছি না। কিন্তু এটাও তো সত্যি বিয়ের বেশির ভাগ অংশ শেষ হয়ে গেছে। বাকিটা কিভাবে শেষ হবে তা নিয়ে এখনই ভাবা দরকার।'

গোবিন্দ বলল, 'আপনি তো সাংঘাতিক মানুষ মশাই। দু দুটো সোমত্ত ছেলে হঠাৎ চলে গেল আর এখন এসব কথা বলছেন?'

'আমি বুঝেছি—আমি জানি।'

'কিছুই জানেন না। জানলে নিজেদের কথা চিন্তা করতেন না। এখানে সবাই বলছে যে আপনার ছেলে অপয়া তাই আমাদের ছেলে দুটো মরে গেল!'

'আপনি অযথা রাগ করছেন। আপনারা আমার আত্মীয়। এটা যেমন আপনাদের শোকের সময় আমাদেরও। কিন্তু বিয়েটা যদি অসমাপ্ত থাকে তা হলে ছেলে মেয়ে দুজনেরই জীবন!'

'আপনার মতলবটা কি!'

'আমি ভাবছি, এখানে যখন আর কোনও কাজ করা সম্ভব নয় তখন কনেকে শিলিগুড়িতে নিয়ে যাই। কাল সকালে অতি সাধারণভাবে বাকি কাজটা সেরে ফেলি।'

কেউ কিছু বলল না। গোবিন্দ তাদের পুরোহিতকে ডেকে বলতেই তিনি বললেন; 'এ বাড়িতে এখন অশৌচ চলছে। কোন শুভ কাজ হবে না। তবে মেয়ের গোত্রান্তর হয়ে গেছে। ওর অশৌচ তিনদিনের। তারপর বাকি কাজটা করা যেতে পারে।'

সতীনাথ মাথা নাড়লেন, 'তবে তাই হোক, তিনদিন বাদে আমরা এসে ওকে নিয়ে যাবো।'

কেউ কোনও কথা বলল না। একটু অপেক্ষা করে সতীনাথবাবু ফিরে গেলেন ছাঁদনাতলায়।

মেয়েমহল থেকে আর্তকান্না ছাড়া এ বাড়িতে আর কোনও আওয়াজ নেই। বিয়ে বাড়ি উজ্জ্বল করছিল যে আলোগুলো তাদের নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে আশেপাশে বাড়ির মানুষ শোকার্তদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নতমুখে। মৃতদেহগুলোকে পোস্টমর্টেম না করে পুলিশ ছাড়বে কিনা সে ব্যাপারে তারা মৃদুস্বরে আলোচনা করছে।

বরযাত্রীরা চন্দ্রনাথকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলে। বরের সাজ সে খুলে ফেলেছে। তাদের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছিল এইরকম অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে চলে যেতে পারলেই ভাল হয়। এইসময় সতীনাথবাবু এলেন। তাঁকে একজন বয়স্ক বরযাত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি কথা হল?'

সতীনাথবাবু বললেন, 'এখন এ ব্যাপারে কথা বলা মানেই অস্বস্তিতে ফেলা।'

'কিন্তু আমাদের দিকটাও তো ভাবা দরকার।' ভদ্রলোক বললেন।

'আমি ভাবছি এখানকার কোনও হোটেলে থেকে যাই।' এরকম বিপদের সময় চলে গেলে নিজের খারাপ লাগবে।' সতীনাথ বললেন।

'আমার কি করা উচিত? তোমার সঙ্গে থাকব?' চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করল।

'নাঃ তুমি বরং চলে যাও। এখানকার কেউ কেউ উত্তেজনায় যুক্তি হারিয়ে ফেলেছে তাই তোমার এখানে থাকার দরকার নেই।' সতীনাথ বললেন।

এইসময় শ্যামল এসে দাঁড়াল সতীনাথের সামনে, 'আপনারা কি চলে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ ভাই। কিন্তু আপনি—!'

'আমি ক্যাটারিং এর দায়িত্ব নিয়েছিলাম। তা হলে আপনাদের খাবার আমি প্যাক করে দিচ্ছি, সঙ্গে নিয়ে যান।' শ্যামল বিনীত গলায় বলল।

অধিকাংশ বরযাত্রী যে খুশি হয়েছে তা তাদের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল। এখন রওনা হয়ে বাড়ি ফিরতে রাত হবে। প্রত্যেকের বাড়িতেই জানে ভাল ভাল খাবার বিয়ে বাড়িতে খেয়ে আসবে। খালি পেটে ফিরে গেলে বাড়িতে খাবার নাও জুটতে পারে। অতএব এই প্রস্তাবে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল তারা। কিন্তু মাথা নাড়লেন সতীনাথ, 'না ভাই, আপনি যা দেবেন তা তো উৎসবের খাওয়া। এই শোকের সময় ওগুলো আমাদের গলা দিয়ে নামবে না।'

শ্যামল আর জোর করল না।

ঠিক তখনই ভিতরে চেঁচামেচি শুরু হল। মহিলারা নিষেধ করছেন কাউকে কিন্তু যাকে নিষেধ করা হচ্ছে সে শুনতে চাইছে না। আর তারপরেই প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এল দিয়া। তার চুল আলুথালু, চোখ ফোলা, মুখে প্রসাধনের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। বর এবং বরযাত্রীদের দলটাকে দেখে এগিয়ে এল সামনে, 'দেখুন, আপনাদের একটা কথা বলা দরকার। শুনলাম তিনদিন পরে আমাকে শিলিগুড়িতে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা হয়েছে কারণ মন্ত্রের কয়েকটা শব্দ নাকি আমার গোত্র পাল্টে দিয়েছে। আমি এটা মানি না। আমার দুই ভাই আজ মারা গেছে। আমার জন্যে, শুধু আমার জন্যে শিলিগুড়ি যেতে হয়েছিল বলে ওরা চলে গেল। আমি এই অবস্থায় আপনাদের ওখানে কিছুতেই যেতে পারব না। আর আমি বুঝতে পারছি না, এই ঘটনার পরেও আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? কিসের আশায়?' প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়ে একটু অপেক্ষা করে দিয়া কাঁদতে কাঁদতে ভেতরে চলে গেল। চন্দ্রনাথ বলল, 'বাবা, চল।'

সতীনাথও সিদ্ধান্ত বদল করলেন, 'না, এর পর আর এখানে থেকে যাওয়ার কোনও কারণ নেই।'

চন্দ্রনাথ স্তব্ধ। আজ সন্ধেবেলা যে মেয়ে বিয়ের কনে হয়ে এখানে এসে বসেছিল তার সঙ্গে বিন্দুমাত্র মিল নেই এই মেয়ের। তার মনে হচ্ছিল কথাগুলো দিয়া তাকে উদ্দেশ্য করেই বলেছে। যেন সে-ই অপরাধী। তার বাবা যা বলেছেন এবং করতে চেয়েছেন তার মধ্যে যেমন কোনও অন্যায় চন্দ্রনাথ দেখতে পাচ্ছিল না তেমনি দিয়ার কথাগুলোকে তো অস্বীকার করতে পারছে না। মৃত্যুসংবাদ শোনামাত্র এদের শোকার্ত দেখে ওরা যদি কাউকে বিরক্ত না করে শিলিগুড়িতে চলে যেত তাহলে কি সেটা শোভন হত? পরে বলা হত, বিপদ দেখে তারা পালিয়ে গিয়েছে। বিয়েটা যখন প্রায় শেষ তখন বাকিটুকুর ব্যাপারে কথা বলার পরিস্থিতি এখন নয় জেনেও সতীনাথ বাধ্য হয়েছেন। বরযাত্রীদের বয়স্ক মানুষরা চাইলেন ওপর ওপর একটা কথা হয়ে যাক তাদের সঙ্গে যারা শোকে ভেঙে পড়েননি। বাবা সেটুকুই বলেছেন। তিনদিন বাদে নিয়ে যাওয়াটা হয়ত একটু বাড়াবাড়ি। সেটা তার বাবার প্রস্তাব কিনা তা তখনও চন্দ্রনাথ জানে না কিন্তু ওইভাবে ছুটে এসে তাকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করানোটা কি উচিত হয়েছে? দিয়া বলে পাঠাতে পারত যে সে এ বাড়ির অশৌচ শেষ না হলে যাবে না। এরকম ছুটে এসে আক্রমণ করা কি শোভন হল? তারও পর ওই শেষ শব্দ দুটো, কিসের আশায়?

প্রশ্নটা চন্দ্রনাথকে বিদ্ধ করেছিল। যাওয়ার ব্যাপারে তো সে কিছুই জানে না। দিয়াকে যদি তিনদিন পরে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয় তাহলে তার কোন আশা পূর্ণ হবে? যার দুই ছোট ভাই তিনদিন আগে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে তার সঙ্গে নিশ্চয়ই প্রেমের সংলাপ বলা যায় না, রস-রসিকতার কথা ভাবা যায় না। দিয়া কি ভাবছে বিয়ের পর স্বামী হিসেবে সে স্ত্রীকে, স্ত্রীর শরীরকে পাবে এই আশায় তিনদিন পরে নিয়ে যেতে চাইছে? কিরকম গুলিয়ে উঠল চন্দ্রনাথের সমস্ত শরীর। সে কোনওমতে বলল, "বাবা, চলো।"

বাসে ওঠার পরেও সতীনাথবাবুর মনে ইতস্তত ভাব ছিল। হাজার হোক মেয়েটা ছেলেমানুষ। শোকে মাথা ঠিক না থাকায় ওরকম গলায় কথাগুলো বলেছে। ওর কথা ধরা কি ঠিক হচ্ছে। তাঁর আজ এখানে থেকে যাওয়াই উচিত কাজ হত। তিনি দেখলেন ছেলের গাড়ি বেরিয়ে গেল। ওখানে ছেলে ছাড়া তার বন্ধুবান্ধবরা রয়েছে। একা কি সিদ্ধান্ত নেবেন বুঝতে না পেরে তিনি ফিরে গেলেন শিলিগুড়িতে।

ছুটন্ত গাড়িতে বন্ধুরা যখন দিয়ার সমালোচনায় মুখর তখন চন্দ্রনাথ এককোণে চুপচাপ বসেছিল। যতই আচমকা শোকে ওরা ভেঙে পড়ুক না কেন বিয়ের কনের ওইভাবে ছুটে এসে অভিযোগের আঙুল তোলাকে কেউ সমর্থন করতে পারছিল না। একজন বলল, 'কি মনে করেছে, অ্যাঁ? ফিল্মস্টার নাকি? চন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কিসের আশায়? এরচেয়ে অপমান আর কিসে করা যায়!' চন্দ্রনাথ কিছু বলছিল না। বন্ধুরা আবিষ্কার করল তাদের খিদে পেয়েছে। বাড়ি ফিরে খাবার পাবে কিনা সন্দেহ। অতএব পথের পাশে একটা ধাবার সামনে গাড়ি দাঁড় করানো হল। এক বন্ধু চন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোর কাছে টাকা আছে তো?'

গাড়িতে বসেই চন্দ্রনাথ মাথা নাড়ল, না।

সে কি রে! বিয়ে করতে গিয়েছিস পকেটে টাকা না নিয়ে?'

আর একজন বলল, 'ধ্যুৎ! ও কেন টাকা নিয়ে বেরুবে? বাজপেয়ী বা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যখন কোথাও যায় তখন কি মানিব্যাগ নিয়ে বের হয়? খরচা সামলাবার জন্য প্রচুর লোক থাকে। চাঁদুর অবস্থা আজ ওদের মত। ঠিক আছে, অর্ডার দে, আমি ধার দিচ্ছি। আজ তো আমাদের চাঁদুর অ্যাকাউন্টে খাওয়ার কথা।'

বরযাত্রীদের বাস এসে গেল। এরা খাওয়াদাওয়া করছে শুনে ওই বাসের যাত্রীরাও নেমে পড়ল।

বন্ধুদের অনেক অনুরোধেও চন্দ্রনাথ খেতে রাজী হল না। তার শরীর গোলাচ্ছে। ছেলে অভুক্ত থাকছে তাই তিনিও খাবেন না বলে সতীনাথ বাসেই বসে থাকলেন।

শ্রাদ্ধের চিঠি এসেছিল ডাকে। দুদিন আগে জলপাইগুড়ি থেকে পোস্ট করা হলেও সেটা পঞ্চাশ কিলোমিটার পার হতে এতটা সময় নিল। সতীনাথ খাম খুলে দেখলেন শ্রাদ্ধ সেইদিনই। ইতিমধ্যে তিনি জেনেছিলেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে সাধারণত তিনদিনেই কাজ হয়ে থাকে। সেটা চিঠি ছাপিয়ে কাউকে জানাবার সময় থাকে না। কিন্তু ওঁরা যে স্বাভাবিক মৃত্যুর পরে যে পদ্ধতিতে শ্রাদ্ধ করা হয় তাই করবেন সেটা তিনি বুঝতে পারেননি। চিঠি পড়েই জানলেন আজই শ্রাদ্ধ।

সতীনাথের মনে হল চিঠিটা যখন এসেছে তখন তাঁর যাওয়া উচিত। এখন সকাল এগারোটা। এখনই রওনা হলে জলপাইগুড়িতে সাড়ে বারোটার মধ্যে দিব্যি পৌঁছনো যাবে। কিন্তু তাঁর স্ত্রী প্রশ্নটা তুলল, 'তুমি কেন যাবে?'

'হাজার হোক একটা আত্মীয়তা তৈরী হয়েছে, নেমন্তন্নর চিঠি পাঠিয়েছেন। আমি শ্রাদ্ধবাড়িতে খাই না, কিছু ফুল দিয়ে আসব।' সতীনাথ বললেন।

'আশ্চর্য! তোমার মান-অপমান বোধ নেই? বিয়ের কনে ওরকমভাবে অপমান করল তার পরেও তুমি যাওয়ার কথা ভাবছ। সেদিন না হয় সবাই আপসেট ছিল, পরে তো মেয়ের বাপ শুনেছে যে মেয়ে কি ব্যবহার করেছে। নিজে না আসুন, একটা চিঠি লিখে দুঃখপ্রকাশ করেছেন? করেননি। আর এ কি রকম নেমন্তন্ন। শেষ মুহূর্তে একটা খাম ডাকবাক্সে ফেলে দিয়েছে। এমন কিছু দূর নয়, এক ঘণ্টার রাস্তা, ওঁদের কেউ আসতে পারল না? এইভাবে ডাকে চিঠি ছুঁড়ে দিল? এ কিরকম ভদ্রতা?

স্ত্রীর কথা উপেক্ষা করতে পারলেন না সতীনাথ।

আগামীকাল কলকাতায় চলে যাবে চন্দ্রনাথ। তার ছুটি শেষ হয়ে এসেছে। কথা ছিল নতুন বউকে নিয়ে সে ফিরে যাবে। সঙ্গে যাবে ওর মা। সল্টলেকে যে ফ্ল্যাট সে ভাড়া করে এসেছে সেখানে সংসার চালু করতে সাহায্য করবেন তিনি। করে দিন সাতেক বাদে ফিরে আসবেন। এখন এসব পরিকল্পনা শিকেয় উঠেছে। চন্দ্রনাথ তার মাকে বলেছে একার জন্য ফ্ল্যাটটা রাখার কোনও মানে হয় না। কিন্তু সতীনাথ তাকে নিষেধ করেছেন। আরও কিছুদিন দেখা যাক না।

সত্যব্রতবাবুর মেয়ে দিয়ার খবর সতীনাথবাবুরা জানতেন না। মাস ছয়েক আগে সত্যব্রতবাবুর এক আত্মীয়, যিনি সতীনাথের প্রতিবেশী, মেয়েটির খবর দেন। ছবি দেখান। দেখেশুনে ভাল লাগে সবার। টেলিফোনে সত্যব্রতবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়। তারপর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দেখে আসেন দিয়াকে। সুন্দরী তো বটেই, ব্যবহার, কথাবার্ত্তায় মুগ্ধ হন তারা। ছেলেকে খবর পাঠান। কলকাতা থেকে ছবি দেখে ছেলে জানায় মা-বাবার ওপর তার আস্থা আছে, ছবিও ভাল লেগেছে তাই তার আলাদা গিয়ে দেখার দরকার নেই। খবরটা শুনে সত্যব্রতবাবু প্রথমে খুশি হন কিন্তু দু'দিন বাদে জানান যে মেয়ে ছেলেটিকে দেখতে চাইছে। বাড়ির অন্যান্য মেয়েরাও একই কথা বলছে। অতএব চন্দ্রনাথকে আসতে হল। দু'জন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সে জলপাইগুড়িতে গেল। সতীনাথ শুনেছেন, চন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলেছেন বাড়ির মেয়েরা এবং দিয়ার বান্ধবীরা। দিয়া শুধু চায়ের ট্রে সামনে রেখে বলেছে, 'কতটা চিনি দেব?' শুনে খুশি হয়েছিলেন সতীনাথ। শুধু তাঁর স্ত্রী বলেছিলেন, 'এটুকু জানার জন্য ছেলেটাকে কলকাতা থেকে নিয়ে এল। অদ্ভুত!' সতীনাথ বলেছিলেন, 'বাঃ। তোমার ছেলে বোবা কিংবা খোঁড়া হতে পারে। ওর ছবি দেখে সেটা বোঝা

যাবে? বেশ করেছে সামনাসামনি দেখেছে। কেন? তোমাকে দেখতে আমি যাই নি?'

তিনদিন বাদে দিয়ার আসা সম্ভব ছিল না এ-কথা সতীনাথবাবু এখন মেনে নিচ্ছেন। কিন্তু শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাওয়ার পর নিশ্চয়ই ওর এখানে আসতে কোনও বাধা থাকবে না। যে কাজগুলো বাকি আছে সেগুলো সেরে ফেলা দরকার। এক্ষেত্রে চন্দ্রনাথের উপস্থিতির প্রয়োজন। অথচ কবে সেটা সম্ভব হবে না জানলে ছেলেকে তিনি শিলিগুড়িতে থাকতে বলতেও পারছেন না। এখন ছেলের জীবনের এই দুর্ঘটনার জন্যে নিজেকেই দায়ী করছেন সতীনাথ। প্রথমত, এখানে যদি সম্বন্ধ না করতেন তাহলে ওই কাণ্ড হত না। যে কোনও মানুষের জীবনে বিয়ে একটা দারুণ রোমাঞ্চকর এবং আনন্দের ব্যাপার। চন্দ্রনাথকে সেটা করতে গিয়ে অপয়া অপবাদ শুনতে হল। বিয়েবাড়ি থেকে চলে আসতে হল বউকে ফেলে রেখে। দ্বিতীয়ত, সত্যব্রতর অনুরোধ মনে রেখে যদি তিনি চন্দ্রনাথকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে জলপাইগুড়িতে পৌঁছতে রওনা না করিয়ে দিতেন তাহলে হয়তো ওই দুর্ঘটনা ঘটত না। তিনি খবর নিয়ে জেনেছেন বাইপাশের রাস্তায় ওরা উন্মাদের মত গাড়ি চালাচ্ছিল। যে রাস্তায় ঘণ্টায় পঞ্চাশ কিলোমিটার স্পিড তোলা মুশকিল হয় সেখানে ওরা নব্বইতে এ চালাচ্ছিল। তাই হঠাৎ বাঁক ঘোরার মুখে একটা লরি দেখে আর সামলাতে পারেনি। বোঝাই যাচ্ছে ওরা বরের গাড়িটাকে ধরার চেষ্টা করছিল। তাছাড়া সত্যব্রতবাবুর ছেলে ফিরে যাওয়ার সময় বলেছিল ওদের গাড়ীতে জায়গা আছে, বরযাত্রীদের কেউ কেউ ইচ্ছে করলে যেতে পারে। যদি তখন ছেলেপক্ষের দু'চারজনকে সতীনাথ ওদের সঙ্গে পাঠাতেন তাহলে তারা ওদের আস্তে চালাতে বাধ্য করতেন। এবং তা হলে চন্দ্রনাথের কপালে ওই দুর্ভোগ ঘটত না।

পুত্রশোক সহ্য করা কঠিন, তার ওপর একসঙ্গে দু'দুটো ছেলের অকালে চলে যাওয়া সামলাতে পারছিলেন না সত্যব্রত এবং তার স্ত্রী। ওদের যে বন্ধুটি দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে ছিল সে ক্রমশ বিপদমুক্ত হয়েছে। অনেকগুলো হাড় ভেঙে গেলেও প্রাণে বেঁচেছে। সে যখন কথা বলার মত অবস্থায় এসেছে তখন গোবিন্দ গিয়ে দেখা করে সব শুনেছিল। ইন্দ্রনীল গাড়ি চালাচ্ছিল। বন্ধুদের নিষেধে সে কান দেয়নি। মোড় ঘোরার সময় আচমকা

লরি দেখত পেয়ে আর স্টিয়ারিং এর উপর কন্ট্রোল রাখতে পারেনি। কিভাবে কিসের সঙ্গে গাড়িটার সংঘর্ষ হয় এটা ছেলেটির মনে নেই।

নিজের, ভাই-এর এবং বন্ধুর মৃত্যুর জন্যে বড় ছেলে দায়ী, এই কথাটা বোধহয় শোকের মাত্রা কিছুটা কমিয়ে দিল। শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলে যখন চারপাশ প্রায় শূন্য তখন গোবিন্দ বিদায় নিতে চাইল। সে তিনদিনের ছুটি নিয়ে দিদির বাড়িতে এসে দু'সপ্তাহের বেশি কাটিয়ে দিয়েছে। ফিরে যাওয়ার আগের বিকেলে ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকা সত্যব্রতর কাছে গিয়ে সে প্রসঙ্গটা তুলল, 'জামাইবাবু, দিয়ার ব্যাপারে কি ভাবলেন?'

সত্যব্রত তাকালেন। তারপর মাথা নাড়লেন, 'জানি না।'

গোবিন্দ বলল, 'জানি না বললে তো হবে না। সেদিন আমরা সবাই উত্তেজিত ছিলাম কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি ওঁদের কোন দোষ ছিল না। সতীনাথবাবু থাকতে চেয়েছিলেন সেই রাত্রে, এটা কম কথা নয়। তাছাড়া, দিয়ার তো বিয়ে শেষ হয়ে এসেছিল। এখন বলতে গেলে ও ওই বাড়ির বউ। বাকি ব্যাপারটা শেষ করে ফেলা দরকার।'

সত্যব্রতর স্ত্রী কথাগুলো শুনছিলেন। বললেন, 'ঠিক বলেছিস তুই। শেষ পর্যন্ত তো ওকে ওই বাড়িতেই যেতে হবে। আমরা তো মেয়ের বিয়ে অন্য কোনোখানে দিতে পারব না।'

সত্যব্রত বললেন, 'মেয়ে কি বলছে?'

'গুম হয়ে বসে আছে।' কেঁদে ফেললেন সত্যব্রতর স্ত্রী। 'ওর বিয়ে না হলে ভাই দুটো মারা যেত না বলে প্রায়ই কান্নাকাটি করছে। সত্যি তো, সত্যি কথাই।'

গোবিন্দ বলল, 'দিদি, কেউ কারও জন্য দায়ী নয়। এ হল ভবিতব্য, কপালে লেখা ছিল। আমি বলি কি পুরুতমশাইকে জিজ্ঞাসা কর এক্ষেত্রে কালাশৌচ লাগবে কিনা, না লাগলে বাকি কাজটা শেষ কর।'

সত্যব্রত বলল, 'এছাড়া উপায় কি! তুমি থাকতে থাকতে যদি কাজটা হয়ে যেত।'

'অসম্ভব।' গোবিন্দ মাথা নাড়ল, 'আমার চাকরি চলে যাবে।'

'মুশকিল হল, বিয়ের দিন সংবাদটা শোনার পর তো আমরা ওদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিনি!'

'হ্যাঁ, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল। শোকে দুঃখে মাথা তো ঠিক থাকে না।' গোবিন্দ বলল।

'আমার তখন ওই অবস্থা , আর কেউ একটু ভলভাবে কথাও বলেনি। তার ওপর দিয়া নাকি মুখের ওপর যাতা বলে দিয়েছে।' সত্যব্রত বিড়বিড় করলেন।

'আমি তো বলেছিলাম, শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন করতে কাউকে পাঠানো উচিত!' গোবিন্দ বলল।

'কে যাবে? আমার তো এই অবস্থা। তুমি দশ দিক সামলাচ্ছো। এখন ভয় হচ্ছে ওদের এসব কথা বলতে গিয়ে আবার অপমানিত না হই।' সত্যব্রত নিঃশ্বাস ফেললেন।

গোবিন্দ হাসল, 'ভুল ভাবছেন। ওঁদের ছেলের বউ, ওঁরা নিশ্চয়ই ঘরে নিয়ে যাবেন।'

সত্যব্রত স্ত্রীকে বললেন মেয়েকে ডেকে দিতে। মেয়ে এল। পরনে সাদা শাড়ি। এতদিন দূরে দূরে ছিল ও। সত্যব্রত দেখলেন এই কদিনে মেয়ের চেহারা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে। লক্ষ্য করলেন এয়োতির কোনও চিহ্ন ওর শরীরে নেই।

সত্যব্রত বললেন, 'আয় মা, এখানে এসে বোস।'

মেয়ে বসল। সত্যব্রত বললেন, 'এবার তো ওদের খবর পাঠাতে হয়।'

'কাদের?' দিয়া মুখ তুলল।

'শিলিগুড়ির কথা বলছি।'

'কেন?'

'বাঃ, বিয়ে তো প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। তুই তো এখন ওদের বাড়ির বউ। তোকে কবে কিভাবে নিয়ে যাবে তার জন্যে কথা বলা দরকার।'

'তুমি একটা ভুল করছ বাবা!' দিয়া স্পষ্ট বলল।

'ভুল? কি ভুল?'

'আমি কারও পুত্রবধূ অথবা কারও স্ত্রী নই।'

গোবিন্দ চুপচাপ শুনছিল। 'আহা, একটুখানি বাকি ছিল তো। শুভদৃষ্টি, মালাবদল তো শেষ হয়ে গিয়েছিল। মন্ত্রটন্ত্র পড়া চলছিল। পাঁচজনে সাক্ষী থেকেছে। বিয়ে হয়নি বললেই হল? বাকি কাজ একটা ভাল দিন দেখে সেরে নিলেই হবে।'

দিয়া মাথা নাড়ল, 'আমি তা মনে করি না। প্রথম কথা, এই মন্ত্রপড়া বিয়ে সম্পূর্ণ হয়নি। হলেও এই বিয়ে আইনের স্বীকৃতি পেত না। এখন তো আইনসঙ্গত বিয়ে মানে মন্ত্রপড়া বিয়ে নয়।'

'বেশ তো! ওদের বলব প্রথমে সইসাবুদ করে নিয়ে তারপর মন্ত্র পড়তে।' সত্যব্রত মেয়ের কথায় বেশ অসহায় বোধ করছিলেন।

'আমার পক্ষে সেটা করা সম্ভব নয় বাবা'। দিয়া উঠে দাঁড়াল।

'সেকি? কেন?'

'এখানে বিয়ে হলে আমি সুখী হব না। কেবলই মনে হবে এই বিয়ের জন্যে আমার ভাই দুটো মরে গেল। ওদের কথা মনে পড়লে আমি কি করে ভাল থাকব? অসম্ভব।'

গোবিন্দ বলল, 'আশ্চর্য! তোর ভাইরা কি ফিরে আসবে? শোক কি তোর একার? আমাদের কথা ছেড়ে দে, তোর বাবামায়ের কথা ভাব।'

'ভেবেছি। কিন্তু তোমরাই সেই রাত্রে চিৎকার করে বলেছিলে ওই লোকটা অপয়া। অপয়া কিনা জানি না কিন্তু খবরটা আসার পর, এবাড়ির সবাই শোকে ভেঙে পড়ার পরও ওরা ছাঁদনাতলায় দাঁড়িয়ে ছিল কিসের আশায়? আমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল কেন? আমার রক্তমাংসের শরীরটার কথা ওরা ভেবেছিল, মনটার কথা ওদের ভাবনায় আসেনি। যে লোকটা আধঘণ্টা ধরে আমার পাশে মন্ত্র পড়ল, শুভদৃষ্টি আর মালাবদল করল, ঘটনাটা জানার পর একবারও আমার কাছে এসে সমব্যথা জানাল না! না, অসম্ভব, আমার পক্ষে ওখানে যাওয়া সম্ভব নয়।' দিয়া বলল।

দুটো মত হয়ে গেল। একদল বলছে, বিয়ে সম্পূর্ণ হয়নি, সইসাবুদ হয়নি যখন তখন দিয়া চন্দ্রনাথের স্ত্রী নয়। আর একদল বলছে, সম্পূর্ণ না হোক মালাবদল তো হয়ে গেছে সবার সামনে, মন্ত্র পড়া হয়েছে তখন হিন্দুমতে সে ওই বাড়ির বউ। এখন আইনের চোখে এটা বিয়ে বলে না মানলেও ধর্মের কথা ভাবলে মানতেই হবে। অবশ্য একটা রেশনকার্ড, একটা পাশপোর্ট, একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে যে কাগজটা দরকার হবে তা দেওয়া যাবে না। এতে জোর পেল প্রথম দল। যদি বনিবনা না হয়, যদি ওরা পরে অত্যাচার করে তা হলে তো মামলা করাও যাবে না। কোর্ট কি মন্ত্রপড়া বিয়ে মানবে? তাঁরাও তো সার্টিফিকেট দেখতে চাইবেন। ডিভোর্সের মামলা করে ক্ষতিপূরণ চাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। তা ছাড়া ছেলেমেয়ে হলে তাদের বাবামায়ের বিয়েটা নিয়েও প্রশ্ন উঠবে। এই আইন চালু হওয়ার আগে যা হওয়ার তা হয়ে গিয়েছে এখন তা অচল।

গোবিন্দ চলে গেল তার কর্মস্থলে। সত্যব্রতবাবু অনেক ভেবেও একটা চিঠি লেখার ভাষা খুঁজে পেলেন না। সতীনাথবাবুকে কি করে জানাবেন যে তার

মেয়ের সিদ্ধান্ত এই। ভাবলেন, অপেক্ষা করা ভাল। ও পক্ষ থেকে যদি প্রস্তাব আসে তা হলেই কথাগুলো বলা যাবে।

চন্দ্রনাথ চলে গেছে কলকাতায়। সতীনাথবাবুর বাড়িতে কারও মৃত্যু হয়নি কিন্তু আবহাওয়া মৃত্যুশোকের চেয়ে কম নয়। এ রকম বিভ্রাট কখনও হবে কেউ কল্পনা করেনি। শেষপর্যন্ত তিনি স্ত্রীর সঙ্গে কথা বললেন, 'কি করা যায়?'

'কি আর করবে? যাদের মেয়ে তাদের কোনও গরজ নেই—।'

'ওঁদের এখন কালাশৌচ চলছে। একটা বছর—!'

'মেয়ের তো গোত্রান্তর হয়ে গিয়েছিল। তার আবার এক বছর কি?'

'চন্দ্র যাওয়ার সময় কিছু বলে গেছে?'

'কি আর বলবে? অপমানে মুখ কালো হয়ে গেছে ওর। ওর বন্ধুরা আমাকে বলেছে, মাসীমা, ভাই-এর মৃত্যুতে শোক পাওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু বিয়ের কনে ওইরকম গলায় চন্দ্রকে বলেছে কিসের আশায় অপেক্ষা করছে এটা চন্দ্র মেনে নিতে পারছে না।' স্ত্রী বললেন।

'স্বাভাবিক, খুব স্বাভাবিক।' সতীনাথ মাথা নাড়লেন, 'তবু আমার মনে হয় একবার কথা বলা দরকার। ভাবছি চিঠি দেব।'

চিঠি এল। সত্যব্রত কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে থাকলেন। গোবিন্দ চলে গেছে তার কর্মস্থলে। স্ত্রীকে ডাকলেন কাছে। একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে এখন স্ত্রী ছাড়া আর কার সঙ্গে পরামর্শ করবেন। বললেন, 'শিলিগুড়ি থেকে চিঠি এসেছে। ওরা আমাদের মতামত জানতে চাইছে।'

'কি লিখেছে?' স্ত্রী দুঁদে উকিলের মত জিজ্ঞাসা করলেন।

'প্রিয়বরেষু। আপনার পাঠানো শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কার্ড আমি একটু দেরিতে পেয়েছি। যখন পেয়েছি তখন আর কিছু করার সময় ছিল না। আপনার এই শোকে সান্ত্বনা দেওয়ার কোন ভাষা আমার জানা নেই। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি যেন তিনি ওঁদের শান্তিতে রাখেন।

শোকদুঃখ পৃথিবীতে থাকলে সহ্য করতেই হয়। এবং তা সত্ত্বেও মানুষ তার কর্তব্য করে যায়। আমাদের একটি কর্তব্য এখনও শেষ হয়নি। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত জানতে আমি আগ্রহী। গোত্রান্তর ইত্যাদির দোহাই হয়তো শাস্ত্রমতে দিয়ে কাজ করা যায় কিন্তু আমি তাতে বিশ্বাসী নই। মনের সায় হল আসল কথা। আপনি নিশ্চয়ই এই অবস্থা বেশি দিন চলুক তা চান না। আমরা সবাই মনে করি যে আপনার কন্যা আমাদের পরিবারের একজন সদস্যা।

সেটাকে আইনসম্মত এবং বাকি আচার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্যে একটি দিন ঠিক করা দরকার।

আমার পুত্র এখন কলকাতায়। তার ছুটি খুব কম। তবু আপনার মতামত জানতে পারলেই তাকে এখানে আসতে লিখব। আপনার এবং আপনার পরিবারের সবাই-এর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—!' চিঠিটি ভাঁজ করলেন সত্যব্রত।

'সহ্য করতে হয়!' ফোঁস করে উঠলেন সত্যব্রতর স্ত্রী, 'নিজের ছেলে মারা গেলে দেখতাম কি করে সহ্য করেন!'

একটু চুপ করে থাকলেন সত্যব্রত, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি লিখব?'

মুখ নিচু করে রইলেন স্ত্রী।

'তুমি কি চাও?' সত্যব্রত জিজ্ঞাসা করলেন।

'দ্যাখো, আমি তো ওদের ব্যবহার কিছু খারাপ দেখছি না, শুধু ওই রাত্রে দিয়াকে নিয়ে যেতে চাওয়ার কথা বলা ছাড়া। কিন্তু —!'

'মেয়েকে জোর করে পাঠাতে চাইছ না?'

'কি করে সম্ভব? আজকালকার মেয়ে, পড়াশুনা করেছে, তা ছাড়া—।'

'তা ছাড়া কি?'

'তোমাকে বলা হয়নি। মাস আটেক আগে ও ব্যাঙ্কের পরীক্ষায় বসেছিল তুমি জানো, সেই পরীক্ষার ফল এসেছে। ওকে কলকাতায় যেতে বলেছে এই মাসের আঠাশ তারিখে।'

'কবে এই চিঠি এল?'

'শ্রাদ্ধের দিন। তখন আর মাথায় ছিল না—!'

'সে কি যেতে চাইছে?'

'হ্যাঁ। বেশ জোর করছে।'

'আশ্চর্য্য! মেয়েকে চাকরি করতে কলকাতায় পাঠাবে তুমি?'

'আমি পাঠাচ্ছি না। কিন্তু তুমি ভবিষ্যতের কথা ভাবো। ও শিলিগুড়িতে কখনোই যাবে না। এ অবস্থায় নিশ্চয়ই ওকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলতে পারি না। মেয়েটার কি হবে? আমরা যদ্দিন থাকবো তদ্দিন না হয় কোনও সমস্যা হবে না, তারপরে? তা ছাড়া চোখের সামনে ও আর পাঁচটা মেয়ের থেকে আলাদা হয়ে থাকবে এটা দেখতে পারবে? তার চেয়ে ও যদি চাকরি করে ভাল থাকে তো থাকুক না।'

মেয়েকে ডেকে পাঠালেন সত্যব্রত। তাঁর কিছুই ভাল লাগছিল না। বরাবরই তিনি শান্তিপ্রিয়। ছেলেরা বড় হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবে, মেয়ের বিয়ে হবে

ভাল পরিবারে, স্বামীর সঙ্গে সুখে থাকবে, এরকম ভাবনা ভেবে এসেছেন। সব কিরকম হয়ে গেল।

'ডেকেছ?' মেয়ে এসে দাঁড়াল।

'শুনলাম কলকাতায় যেতে চাইছ।' সত্যব্রত বললেন।

'হ্যাঁ। ব্যাঙ্কের পরীক্ষায় পাশ করেছি।'

'আমাকে বলনি তো।'

মেয়ে মাথা নিচু করে বলল, 'বলতাম।'

'কার সঙ্গে যাবে?' সত্যব্রত জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় গিয়ে উঠবে?'

'এখনও কিছু ভাবিনি।'

'এই চাকরিটা পেলে তুমি আর অন্য কিছুর কথা ভাববে না?'

'না। আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'ওঁরা চিঠি লিখেছেন। তাহলে ওঁদের জানিয়ে দিই যে ইচ্ছে করলে ছেলের বিয়ে অন্য জায়গায় দিতে পারেন। অবশ্য হিন্দুমতে চন্দ্রনাথের সঙ্গে আর কেউ মেয়ের বিয়ে দিতে চাইবে কিনা জানি না!'

'এটা তো ওঁদের সমস্যা বাবা।'

সত্যব্রত আর কথা বাড়ালেন না। কিছুক্ষণ বাদে তিনি চিঠি লিখলেন। মেয়ের ইচ্ছের কথা জানিয়ে দিলেন অনেক দুঃখ প্রকাশ করে। চিঠি এবং হিরের আংটি আর দুল পাঠিয়ে দিলেন লোক মারফত।

দিয়া চাকরি পেল। কলকাতায় নয়, বোলপুরের একটি ব্যাঙ্কে তার পোস্টিং হল। সত্যব্রতকে যেতে হল স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লীতে সত্যব্রতর এক বন্ধু থাকেন। তাঁর বাড়িতে প্রচুর জায়গা। সত্যব্রত চেয়েছিলেন বন্ধু মেয়েকে পেয়িং গেস্ট হিসেবে রাখুন। কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। তাঁর সন্তান নেই, বন্ধুর মেয়ে তো নিজের মেয়ের মত। শেষ তক ঠিক হল, দিয়া ও বাড়িতে থেকে নিজের রান্না নিজেই করে নেবে। সত্যব্রত নিশ্চিন্ত হলেন।

চাকরি পেয়ে স্বাবলম্বী হওয়া দিয়ার জীবনটাকে স্বাভাবিক করে দিল। সে অনেকবার এ নিয়ে ভেবেছে। বিয়ের দিন যদি দুর্ঘটনা না ঘটতো তা হলে তাকে এতদিনে চন্দ্রনাথের স্ত্রী হয়ে কলকাতায় থাকতে হত। তার কোনও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকতো না। এই চাকরিটা নিয়ে বোলপুরে আসতে নিশ্চয়ই চন্দ্রনাথ তাকে অনুমতি দিত না। অনুমতি নেওয়া মানে আর একজনের অধীনে থাকা। দুই ভাই জীবন দিয়ে তাকে সেই বাধ্যবাধকতা থেকে বাঁচিয়ে দিল।

দিয়া সুন্দরী, ভাল কথা বলে। সৌভাগ্যক্রমে তাদের বোলপুরের ব্রাঞ্চের সমস্ত কর্মীই বিবাহিত। ফলে স্বস্তিতে কাজ করতে পারত দিয়া। চটপট কাজ

শিখে নিয়েছিল সে। কিন্তু ক্রমশ সে আবিষ্কার করল বিবাহিত পুরুষরাও সবসময় নিরাপদ নয়। বিশেষ করে যাদের স্ত্রী সঙ্গে থাকেন না। ম্যানেজার ভদ্রলোকটি সেই শ্রেণীর। ছেলের পড়াশুনার জন্যে ওঁর স্ত্রী থাকেন কলকাতায়। ভদ্রলোক প্রত্যেক শনিবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ধরে কলকাতায় যান, সোমবারে ফিরে আসেন। কিন্তু একটু একা পেলেই তার কাছে হা হুতাশ করা আরম্ভ করেছেন। স্ত্রীর সঙ্গে কত কষ্টে যে মানিয়ে আছেন তাই বোঝাতে চান। ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি দিয়ার। মাত্র কয়েকমাস আগে হলে হয়তো ভদ্রলোকের জন্যে ওর কষ্ট হতো। কিন্তু নিজের জীবনের পালাবদল ওকে সতর্ক করে দিয়েছে, কিভাবে পা ফেলতে হয় তা শিখিয়েছে। এবং এই শিক্ষা থেকেই ভদ্রলোককে না চটিয়ে ও নিজেকে সরিয়ে রাখতে পেরেছে। এই চাকরি তার আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করেছে।

তবু ছুটির পর পূর্বপল্লীর রাস্তায় হাঁটার সময় বিকেলের শেষ আলো দেখে মন বিষণ্ণ হয়ে যায়। কি রকম একটা খারাপ লাগায় আক্রান্ত হয়। বাবার বন্ধু রোজ সন্ধেবেলায় এস্রাজ নিয়ে বসেন। রবীন্দ্রনাথের পূজো পর্বের গানগুলো চমৎকার বাজে তাঁর গলায়। দিয়া তাই শোনে, শুনলে মন ভাল হয়ে যায়।

এই কাহিনী এ ভাবেই শেষ হয়ে যেতে পারত। কিন্তু চন্দ্রনাথের সঙ্গে দিয়ার দেখা হল। বছর খানেক বাদে জলপাইগুড়িতে ফিরছিল দিয়া। দিন চারেকের ছুটি পাওয়া গিয়েছে। দার্জিলিং মেলের এ সি টু টায়ারের টিকিট কেটেছিল সে। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নেমে হলদিবাড়ি লোকাল ধরে জলপাইগুড়িতে যাবে। রাত সাড়ে নটার পর দার্জিলিং মেল বোলপুর স্টেশনে এসে পৌঁছয়। কুলি তার মালপত্র সিটের নিচে ঢুকিয়ে দিয়ে টাকা নিয়ে চলে গেলে পর্দা সরালো দিয়া। চারজনের বাথ। দুজন বয়স্ক পুরুষ এবং মহিলা বসে আছেন এক পাশে। তৃতীয়জন নেই। দিয়া বসতেই ভদ্রমহিলা তার দিকে তাকালেন, 'শিলিগুড়ি যাবেন?'

'না, জলপাইগুড়ি।'

'বোলপুরেই থাকেন?'

'হ্যাঁ, চাকরি করি এখানে।' উত্তরটা দিয়ে দিয়া বুঝল মহিলা একটু কৌতূহলী ধরনের।

ভদ্রলোক বললেন, 'দেখেছ, আজকাল মেয়েরা কত স্মার্ট হয়ে গেছে।'

'তোমরা আমাদের পরাধীন করে রেখেছিলে, তাই আমরা পারিনি।' মহিলা গম্ভীর হলেন।

এই সময় ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছাড়ল। এসি কামরায় বসলে জানালা দিয়ে বাইরেটা ভাল করে দেখা যায় না। তার ওপরে এখন রাত। দিয়া খাওয়া দাওয়া করেই স্টেশনে এসেছিল। এখন শুয়ে পড়লেই হয়। তার ওপরের বাথ। সে যখন উঠব উঠব করছে তখন তৃতীয় যাত্রী ফিরে এল। তার দিকে তাকাতেই চমকে উঠল সে। গল্প উপন্যাসে যা হয় তা জীবনে সচরাচর ঘটে না। লোকটার চেহারা একই আছে। কিন্তু তার দিকে তাকাচ্ছে না লোকটা, একপাশে এসে বসল গম্ভীর মুখে। ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার শোওয়ার জায়গা কোনটা, নিচে না ওপরে?'

আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছেন মহিলা। বয়সের সুযোগ তাঁকে নিতে দিল দিয়া। বলল,'ওপরে।' ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন, ও বাবা, ওপরে শুলে আমার মনে হবে যে কোনও মুহূর্তে পড়ে যাব। এই যে ভাই, আপনি ওপরে শুলে খুব অসুবিধে হবে?'

প্রশ্নটা যাকে করা হল, সে এবার তাকাল। প্রথমে অবাক হওয়া, তারপর একটু অবিশ্বাস, শেষে নিঃসন্দেহ হয়ে মাথা নাড়া, 'না না, আমার অসুবিধা হবে না।'

'তাহলে তাই ভাল। তুমি নিচেয় শোও, উনি ওপরে উঠে যাচ্ছেন।'

'কোনও দরকার নেই। আমি ওপরেই শোব।' দিয়া বলল।

'না না অত পরিশ্রম করতে হবে না।' ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন।

ভদ্রলোক বললেন, 'আশ্চর্য! উনি যখন চাইছেন—!'

'তুমি থামো তো! শোন, তুমি নিচে শুলে আমি পাশ ফিরলেই তোমাকে দেখতে পাব। আমার অস্বস্তি হবে না।' হেসে ফেললেন ভদ্রমহিলা।

চন্দ্রনাথ হেসে ফেলল, 'আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না। ওপরে শুতে আমার ভালই লাগবে।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'তা হলে খাওয়াদাওয়া করে নিন।'

চন্দ্রনাথ বলল, 'ওটা হয়ে গেছে। তারপর রেল কম্পানির দেওয়া বালিশ কম্বল নিয়ে ওপরে উঠে গেল।'

এতক্ষণ নিঝুম হয়ে বসেছিল দিয়া। মানুষটাকে তো ভদ্রলোক বলেই মনে হচ্ছে তার। কিন্তু কথাবার্তায় আচরণে একটিবারও মনে হয়নি তাকে চিনতে পেরেছে। সত্যি কি পারেনি? সে ঠিক করল, এক ঘুমে রাতটা কাটিয়ে দেবে। নিউজলপাইগুড়িতে নেমে তো দুজনে দুদিকে চলে যাবে।

চারজনেই শুয়ে পড়ার আগে আলো নেভানো হল। পাশের একতলার বাঙ্কে শোওয়া ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি গো, ঘুমিয়ে পড়লে?'

'না।'

'নামটাই জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

'দিয়া।'

'আমার নাম প্রভাতী মুখার্জী, উনি রেভিন্যু সার্ভিসে ছিলেন।'

'ও।'

'বোলপুরে তুমি একাই থাকো?'

'হ্যাঁ।'

'মা বাবার কাছে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

দিয়া জবাব দেওয়ার সময় বিরক্ত হচ্ছিল। ঠিক তার ওপরের বাঙ্কে শুয়ে থাকা লোকটা নিশ্চয়ই কান খাড়া করে আছে। হঠাৎ ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন,'দেখে তো বুঝেছি বিয়ে করোনি, তেমন কোনও বন্ধু আছে নাকি?'

এবার মজা লাগল দিয়ার, 'কেন?'

'না, না যদি থাকে তা হলে তোমার বাবা মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতাম। আমার বোনের ছেলে থাকে আমেরিকায়। তার ইচ্ছে খাঁটি বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করবে।' ভদ্রমহিলা বেশ সিরিয়াস, 'তোমার যদি আপত্তি না থাকে—!'

দিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'ভদ্রলোক খুব উদার তো?'

'কেন? তোমার কোনও কেস আছে নাকি?'

'হ্যাঁ। আমার একবার বিয়ে শুরু হয়েছিল, শেষ হয়নি। শেষ না হলে ওটাকে বিয়ে বলে না, তাই না? তবে ব্যাপারটা তো আগে জানিয়ে দেওয়া দরকার, তাই বললাম।' কথাগুলো বলেই আধো অন্ধকারে দিয়া বুঝতে পারলো ভদ্রমহিলা ওপাশ ফিরে শুলেন। সে হেসে ফেলল। আর মুখ খুলবেন না ইনি। কিন্তু ওপরে যিনি শুয়ে আছেন তাঁর কানে নিশ্চয়ই ওই কথাগুলো ঢুকেছে। ঢুকুক।

ট্রেনে ভাল ঘুম হয় না। তবু প্রায় আটটা পর্যন্ত দিয়া শুয়ে থাকল কারণ অন্য যাত্রীরা ওঠেনি। লেট করে না থাকলে আর আধঘণ্টার মধ্যেই নিউজলপাইগুড়ি স্টেশনে পৌঁছে যাওয়ার কথা। দিয়া উঠল। তোয়ালে নিয়ে টয়লেটে গেল। একটু ধাতস্থ হয়ে বাইরে বেরিয়ে মনে হল এক কাপ চা খেলে ভাল লাগবে। এই জায়গাটা শীততাপনিয়ন্ত্রিণে নেই।

'ঘুম হয়েছে?' প্রশ্নটা শুনে চমকে তাকাল দিয়া। চন্দ্রনাথ এসে দাঁড়িয়েছে।

এড়িয়ে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। দিয়া মাথা নাড়ল, 'না হওয়ার তো কোনও কারণ নেই।'

'অনেকের দেখেছি ট্রেনে ঘুম হয় না'। চন্দ্রনাথ বলল।

'হতে পারে।'

এইসময় একটি চাওয়ালাকে ও পাশের করিডোর দিয়ে এগিয়ে আসতে দেখে দিয়া বলল, 'চা দাওতো।'

লোকটা ঝটপট দুটো গ্লাসে চা ঢেলে দুজনের দিকে এগিয়ে দিল।

চন্দ্রনাথ বলল, 'আমি তো চা চাইনি।'

চাওয়ালা বলল, 'ঢেলে ফেলেছি বাবু, খেয়ে নিন।'

দিয়ার রাগ হল, 'কেন? চা খাওয়া হয় না?'

'খুব কম। কত হয়েছে ভাই?' চায়ের গ্লাস নিয়ে চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করল।

'ওকে আমি ডেকেছি। আমার ব্যাগটা ভেতরে আছে, তুমি ভাই ভেতরে গিয়ে দাম নেবে।'

'ঠিক আছে দিদি।' চাওয়ালা ভেতরে ঢুকে গেল।

ট্রেন চলছে। তার দুলুনি সামলে চায়ে চুমুক দিতে হচ্ছিল। চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করল, 'চাকরি করতে কেমন লাগছে?'

'চাকরি? খবরটা কে দিল?'

'ওই যে শুনলাম। মহিলাটি তো খবর নিচ্ছিলেন।'

'ও। ভালই। যেমন লাগা উচিত।'

'অনেকদিন হয়ে গেল?'

'কয়েকমাস।' প্লাস্টিকের গ্লাস জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে ভেতরে ঢুকে গেল দিয়া। চায়ের ছেলেটিকে দাম মিটিয়ে দিয়ে বসতেই দেখল ভদ্রমহিলা জিনিসপত্র গোছগাছ করছেন। গত রাতে যে ভাবে কথা শুরু করেছিলেন তার সঙ্গে এখনকার ভাবভঙ্গীর কোনও মিল নেই। চন্দ্রনাথ ফিরল। একটু দূরত্ব রেখে বসল। মহিলা তার দিকে তাকাচ্ছেনই না। দিয়া জিজ্ঞাসা করল, 'ট্রেন কি লেটে যাচ্ছে?'

ভদ্রলোক ঘড়ি দেখলেন। চন্দ্রনাথ বলল, 'পনের কুড়ি মিনিট। জলপাইগুড়ি লোকালটা পাওয়া যাবে। ওটা না পেলে তো বেশ ঝামেলা হবে।'

দিয়া বলল, 'ঝামেলা আর কি! রিক্সা নিয়ে সোজা জলপাইগুড়ির মোড়ে গিয়ে বাস ধরতে হবে। ট্রেনটা পেলে সুবিধা।'

'ছুটি কতদিনের?'

'এই কটা দিন।'

'বাড়ির আবহাওয়া এখন কেমন?'

'জানি না। সময় সবচেয়ে বড় ওষুধ। ঠিক সামলে দেয়।'

'ঠিকই।' চন্দ্রনাথ মাথা নাড়ল।

ভদ্রমহিলা এবার মুখ তুলে তাকালেন। তিনি যে খুব অবাক হয়ে গিয়েছেন তা বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু ততক্ষণে ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকে গেছে। কুলিদের হাঁকাহাঁকি, চিৎকার ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে দিয়া তার ব্যাগ নিয়ে নিচে নামল। চন্দ্রনাথও তার ব্যাগ নিয়ে নিচে নেমে একজন রেলের লোককে জিজ্ঞাসা করে মাথা নাড়ল, 'ঝামেলাটা হলই।'

'মানে?' দিয়া তাকাল।

'লোকালটা বাতিল হয়েছে আজ। রিক্সা করে বাস রাস্তা পর্যন্ত যেতে হবে।'

কথা না বাড়িয়ে ওভারব্রিজের দিকে এগিয়ে গেল দিয়া। যথেষ্ট হয়েছে। এর বেশি কথাবর্তা সদ্যচেনা কোনও সহযাত্রীর সঙ্গে কেউ বলে না। চন্দ্রনাথ পিছন পিছন আসছে কিনা তা সে মুখ ঘুরিয়ে দেখল না। জলপাইগুড়ির লোকাল ট্রেন বন্ধ হওয়ায় বাইরে তখন বেশ ভিড় জমেছে। সুযোগ বুঝে রিক্সাওয়ালা ভাড়া বাড়িয়েছে। ট্যাক্সি বা অটোয় যেতে হলে শিলিগুড়ি শহরে যেতে হবে। এটুকু পথ কেউ যাবে না।

'খুব অসুবিধে না হলে আমার সঙ্গে যেতে পারেন।' চন্দ্রনাথ পাশে এসে দাঁড়াল।

'আপনি তো শিলিগুড়ি যাবেন।'

'হ্যাঁ। এখন জলপাই মোড়ে গিয়ে বাসে জায়গা পাবেন না। শিলিগুড়ির স্ট্যাণ্ড থেকে ওঠা যেতে পারে। আমি একটা অটোকে ম্যানেজ করেছি।' চন্দ্রনাথ বলল।

'না, থাক।'

'আমি একা যাচ্ছি, আপনি গেলে আমার কোনও অসুবিধা হবে না। অবশ্য আপনার যদি আপত্তি থাকে তা হলে আলাদা কথা।' চন্দ্রনাথ হাসল।

দিয়া মনস্থির করতে পারছিল না। শেষ তক বলল,'আমি ভাড়াটা শেয়ার করব।'

'বেশ তো।'

অতএব অটোয় উঠল ওরা। পাশাপাশি কিন্তু দুজনের মধ্যে প্রায় একফুটের দূরত্ব। কেউ কোনও কথা বলছিল না। বিভিন্ন পাড়ার মধ্য দিয়ে গলি উপ গলি পেরিয়ে অটো ছুটছিল রাস্তা বাঁচাতে। চন্দ্রনাথ একসময় অটোওলাকে বলল, 'আগে এয়ার ভিউ হোটেলে চল।'

'এই যে বললেন হাসপাতাল পাড়া। বেশি ভাড়া লাগবে।'

'বেশ তো নিও।' চন্দ্রনাথ বলল।

আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ। চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করল, 'ফেরার টিকিট হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ'। দিয়া জবাব দিল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার?'

'নাঃ। আপনার বাবা অনেকদিন আগে একটা চিঠি লিখেছিলেন আমার বাবাকে। আর তারপর থেকেই বাবা আমাকে লিখছেন আসার জন্য। ওই বিয়ে নিয়ে একটা আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে। পশ্চিমবাংলায় তো মেয়েদের স্বাধীনতা কম। আমার ঘটনা জানার পরও অনেক মেয়ের বাবা বাড়িতে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। অথচ দেখুন, কাল রাত্রে আপনি ভদ্রমহিলাকে উদারতার কথা বলতেই তিনি পাল্টে গেলেন। পাত্রীর ব্যাপারে আমেরিকান পাত্রও কিরকম অনুদার।'

'হ্যাঁ। কিন্তু ভাববেন না, এ নিয়ে আমার কোনও আফশোষ আছে।'

'ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ কেন?'

'ব্যতিক্রম তো খুব কম চোখে পড়ে।' চন্দ্রনাথ বলল, 'এসে গেছে।'

ওরা অটো থেকে নামল। ভাড়া জিজ্ঞাসা করে অর্ধেক ভাড়া এগিয়ে দিল দিয়া। চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করল, 'দিতেই হবে?'

'নিশ্চয়ই।' টাকাটা দিয়ে বলল দিয়া, 'এবং অভিনন্দন।'

'কেন?'

'ভুলটাকে ঝেড়ে ফেলে সঠিক পথে হাঁটছেন বলে।'

'ঝেড়ে ফেলে দেওয়া এতই সহজ? সেটা বলতেই তো শিলিগুড়িতে এসেছি। আপনার বাস এসে গিয়েছে।' চন্দ্রনাথ হাত দেখালো ড্রাইভারকে। দিয়ার কিরকম গোলমাল হয়ে গেল। সে বলল,'এটায় বড্ড ভিড়। পরের বাসটায় যাব। আপনার দেরি হয়ে যাবে না তো?'

চন্দ্রনাথ মাথা নাড়ল, 'একটুও না।'